বাংলা গানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শান্তিসুধা মুখার্জ্জী

সংগীতের দুই রূপ -- এক হচ্ছে বিশুদ্ধ সংগীত। যার প্রকাশ যন্ত্র সংগীতে বা তারানায়। অপরটি হচ্ছে কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মানুষের মধ্যে। প্রকৃতিভেদে সংগীতের এই দু রকম অভিব্যক্তি হয়। বাংলায় বরাবর দ্বিতীয় ধারাটির প্রাধান্য।
বাঙ্গালী জাতির উদ্ভবের আদি পর্বে যখন ভাল করে বাংলা ভাষা গড়ে ওঠেনি তখনও তার গান ছিল। নানারকম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নৃত্যভঙ্গিতে সারি সারি লোক চলেছে, প্রাচীন মন্দির গাত্রের এই ধরনের নক্‌শা আমাদের মনে একটা ব্যাপক সংগীত চর্চার ছাপ এনে দেয়, কিন্তু তার কিছু বেশী জানায় না। সেই নীরব শোভাযাত্রা যদি কোন মন্ত্রবলে মুখর হয়ে উঠত তাহলে ইতিহাসের মৌন যবনিকা যেত সরে। কিন্তু তাতো হবার নয়। শুধু সুপ্রাচীন যুগ কেন, পুরো মধ্যযুগ ধরেই আমরা বাঙালীর গীতচর্চার যেটুকু পেয়েছি তা শুধু তার লেখা গানের কথা। কিন্তু সুর না থাকলে গানের কথার কতটুকু মূল্য থাকে ? পাঠ্য কবিতার কবি নিরবধি কাল ও বিপুল পৃথ্বীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারেন। কিন্তু গানের কথাটুকু নিজেকে প্রাণবান করবার জন্য সুর ও কণ্ঠ সংযোগের অপেক্ষা রাখে। কীর্তন প্রভৃতির পরম্পরা থেকে সেই সুর কেমন ছিল তার অতি অল্প অনুমান আমরা করতে পারি মাত্র। মধ্যযুগের গানের আলোচনা তাই অনেকখানি অনুমান নির্ভর।

জয়দেব –

বাংলা গানের আদিকবি জয়দেব। তিনি সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষণসেনের(১১১৭-১১৯৯) সভাকবি ছিলেন। তার গীতগোবিন্দ দ্বাদশ সর্গে সম্পূর্ন উক্তি-প্রত্যুক্তি-গীতময় রাধাকৃষ্ণের মিলন লীলা। গানগুলিতে সুস্পষ্ট রাগতালের উল্লেখ আছে গুর্জরী, বসন্ত, মল্লার, গৌড়, কর্নাট, ভৈরবী প্রভৃতি রাগ এবং যতি, একতাল, রূপক প্রভৃতি তাল। জয়দেব যদিও গীতগোবিন্দ কাব্যটি সংস্কৃত ভাষায় লিখেছিলেন তবু সে সংস্কৃত প্রাকৃত ঘেঁষা এবং ছন্দ পুরোপুরিই প্রাকৃত ছিল। তাছাড়া পরবর্তী বাংলার পদরচনা বা গীতি সাহিত্যের উপর ভাবে ভাষার তাঁর প্রভাব ছিল সর্বাত্মক। তাই সংস্কৃতে লেখা হলেও জয়দেবের রচনা বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ বলেই গণ্য হয়। জয়দেবের একটি গানের অংশ বিশেষ উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হল।

প্রলয় পয়োধি জলে ধৃতবানসি বেদম।
বিহিত বহিত্র চরিত্র মখেদম ।।
কেশব ধৃত মীনশরীর জয় জগদীশ হরে ।।
ক্ষিতিরতি বিপুলভার তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে।
ধরণীধরণকিন চক্রগরিষ্ঠে।।
কেশব ধৃত কূর্মশরীর জয় জগদীশ হরে ।।

চর্যাপদ –

বাংলার ভাষার প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদ, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের লেখা কিছু পদ বা গানের সংকলন। নিজেদের সাধন ভজনের মূল কথাগুলি এখানে কবিরা সাংকেতিক ভাষায় লিখে রেখেছেন। এতে কবিতার ছন্দ আছে, তবে গান বলেই তা একটু ঢিলেঢালা। পটমঞ্জরী, ভৈরবী, কামোদ, মল্লার প্রভৃতি রাগেরও উল্লেখ আছে। জয়দেবের গানে যেখানে সেকালের অভিজাত গোষ্ঠীর সংগীত চর্চার নিদর্শন ধরা আছে এঁদের গানে সেখানে আছে বাংলার লোকায়ত সংগীতের অন্যতম রূপ। একটি উদাহরণ ----

ভবনই গহন গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী ।।
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই ।
পারগামী লোঅ নিভর তরই ।।

মধ্যযুগের সূচনা –

দ্বাদশ ত্রয়াদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশে তুর্কি আক্রমণ হল। এর পরবর্তী দেড়শ/দুশো বছরের যাবতীয় ইতিহাস লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ইতিহাস না থাকলেও জনজীবনের প্রবাহ যে নিজস্ব রীতিতে শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং বিবর্তিত হয়েছে তার প্রমাণ আমরা পাই চতুর্দশ শতকের শেষাশেষি আবার যখন – বিস্মৃতি সমুদ্রের তলদেশ থেকে বাঙ্গালীর ইতিহাস জেগে উঠল।

ইত্যবসরে (১) বাংলাভাষা মোটামুটি তৈরী হয়ে গেছে, (২)ছোট-বড় রাজা জমিদারের ক্ষমতাবৃত্ত নতুন করে তৈরী হয়েছে এবং (৩) প্রধান সাহিত্য শাখাগুলি সবই উঁকি ঝুঁকি দিতে শুরু করেছে ।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন বা শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ –

বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মধ্যযুগের যত পুঁথি পাওয়া গেছে তার মধ্যে সব চেয়ে পুরানো। কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ঐ রচনাটি গীত-গোবিন্দের মতই উক্তি প্রত্যুক্তি গীতময় রচনা। এতে সুর তালের উল্লেখ আছে এবং স্থানে স্থানে ধ্রুবপদ বা ধুয়া চিহ্নিত করা আছে। সে কালে যাকে নাট-গীতপালা বলত (আধুনিক গীতিনাট্যের রকমফের) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তাই । একটি গানের অংশ এইরকম -
মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ ।
বিকসিত ফুলগন্ধ বহুদূর জাএ ।।
এবেঁ ঝাঁটি আন বড়ায়ি নান্দের নন্দন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাঙ্গালীগণ ।।

মধ্যযুগের আখ্যান কাব্য -

পুরাণ কথার অনুবাদ ও লোককাহিনীভিত্তিক মঙ্গলকাব্য নিয়ে মধ্যযুগে আখ্যান কাব্যের একটা বিরাট ভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল। এগুলি অবশ্যই গান নয় । কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে সমসাময়িক কালে এদের গান বলেই নির্দেশ করা হত, যেমন মনসার ভাসান গান, রামায়ণ গান, মঙ্গলচণ্ডীর গীত প্রভৃতি। এইরকম নামকরণের কারণ হল - এদের পরিবেশনে গানের মত একটা সুর থাকত। মৃদঙ্গ, মন্দিরা, চামর ও নূপুর সহযোগে এক বা একাধিক গায়ক (মূল গায়ক ও দোহার) নৃত্য গীত অভিনয়ের মিশেলে এগুলি পরিবেশন করত। আসলে এগুলি ছিল পাঁচালি। পাঁচালি গান নয়। তবে কোনো কোনো কবি নিজ প্রবণতা অনুযায়ী ধারাবাহিক বিবরণের মাঝখানে ফাঁক খুঁজে দু চারটে গানও বসিয়ে দিতেন। এ বিষয়ে সবচেয়ে দক্ষতা দেখিয়েছেন ভারতচন্দ্র। তাঁর একটি গানের উদাহরণ দেওয়া গেল -
ওহে বিনোদরায় ধীরে যাও হে ।
অধরে মধুর হাসি বাঁশিটি বাজাও হে ।।
নব জলধর তনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু পীতধড়া বিজুলিতে ময়ূরে নাচাও হে ।
নয়ন চকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর মুখ সুধাকর হাসি সুধায় বাঁচাও হে ।।

বৈষ্ণবপদাবলী ও কীর্তন -

মধ্যযুগে যে গানে বাঙ্গালী মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল তা হল কীর্তন। কীর্তনের উৎস বৈষ্ণব পদাবলী । চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) আগেই পদাবলীর সর্বপ্রধান দুজন কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস (ইনি বড়ু চণ্ডীদাস নন) যথাক্রমে ব্রজবুলি ও বাংলার পদাবলীর দুটি ধারা তৈরী করে দিয়েছিলেন। সুর ব্যতীত শুধু কবিতা হিসাবেও তাঁদের রচনা অতিশয় উপভোগ্য ।সুর সংযোগে তা নিশ্চয় মধুরতর ছিল । এরপর চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের যে উজ্জীবন হয় তাতে পদাবলী রচনায় বান ডেকেছিল। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর কিছুকাল পরে খেতুরীতে বৈষ্ণবদের মহোৎসব হয় । সেখানে নরোত্তম দাস ঠাকুর ধ্রুপদী রীতিতে পদ গান করে যে ধারার সূচনা করেন সেটিই লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন। বৈঠকী গানের মত কীর্তনের রাগ রাগিনী আছে। কিন্তু সেখানকার মত ধরাবাঁধা সর্গম এখানে অনুসৃত হয়না। এ একটা স্বতন্ত্র রীতির সংগীত। এখানে ভাবের প্রাধান্য এবং গায়কের প্রচুর স্বাধীনতা আছে। গানের অর্থ পরিস্ফুট করবার জন্য এখানে গায়ক মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশ বা আখর (অক্ষর) যোগ করেন। তাতে পরিবেশনটি নাটকীয় হয়ে ওঠে । গায়নরীতি অনুসারে কীর্তন চার শ্রেণীতে বিভক্ত-- গরানহাটি , মনোহরশাহী, রেনেটি, মন্দারিনী। এদের মধ্যে মনোহরশাহীরই প্রাধান্য। কীর্তন গানের পরম্পরা মধ্যযুগ থেকে আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে। হয়তো পুরানো গায়ন পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকবে। কিন্তু কাঠামোটি নষ্ট হয়নি। বিদ্যাপতির একটি পদ উদাহরণস্বরূপ দেওয়া হল ।------
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ ।
নয়ন না তিরপিত ভেল ।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখলুঁ তবু হিয় জুড়ন না গেল ।।
যত বিদগধজন রস অনুমগন অনুভবি কাহু ন পেখ ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে লাখে ন মিলল এক ।।

শাক্ত পদাবলী -

কিছু দেবদেবী ও গৌরাঙ্গ বন্দনা ছাড়া এতদিন পর্যন্ত বাঙালীর গানে ঘুরে ফিরে খালি কৃষ্ণ কথাই বলা হত। সেই জন্যই বোধহয় ''কানু বিনে গীত নাই '' এই প্রবাদ বাক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু মধ্যযুগের শেষে এসে অষ্টাদশ শতকের এক অভিনব গীতশাখা দেখা দিল যার সঙ্গে কৃষ্ণকথার সম্পর্ক নেই। এ ধারার স্রষ্টা ও সর্বোত্তম কবি রাম প্রসাদ সেন। এই গীতশাখার নাম শাক্ত পদাবলী ।
শাক্ত পদাবলী দুভাগে বিভক্ত - কিছু উমাবিষয়ক আগমনী ও বিজয়া গান; আর বেশির ভাগ কালিপাদপদ্মে কবির আত্মনিবেদনের গান;

এই গানগুলিতে রাধাকৃষ্ণের মত কোন কাহিনীর আড়াল ছাড়াই কবি সোজাসুজি নিজের মনের আকুতি জানিয়েছেন।
তাই ঐতিহাসিকেরা মনে করেন বাংলা কাব্য সংগীতের প্রকৃত সূচনা এখান থেকেই।
রাম প্রসাদের কাব্যভাষার মাটি ঘেঁষা সরলতা আমাদের মন মুগ্ধ করে। সেই সঙ্গে এই কথার উপযোগী লোকসংগীত ঘেঁষা এক ধরণের টানা সুরও তিনি তৈরি করেছেন। সুর ও কথার অপূর্ব সম্মিলনে তাঁর গানগুলি সোজা আমাদের মর্মে গিয়ে আঘাত করে। রাম প্রসাদী গানের পরম্পরা এখনও বহমান। একটি কাব্যাংশ উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া গেল -

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে ।
মা বেটি কি মাটির মেয়ে মিছে খাটি মাটি নিয়ে ।
শুনেছি মার বরণ কালো সে কালোতে ভু বন আলো ।
মায়ের মত হয় কি কালো মাটিতে রং মাখাইয়ে ।।
অশিবনাশিনী কালী সে কি মাটি খড় বিচালি ।
কে ঘুচাবে মনের কালি প্রসাদে কালি দেখাইয়ে।।

অষ্টাদশ শতকের যে সময়ে রাম প্রসাদ এই কালিনাম উচ্চারণ করলেন বাংলার ইতিহাসে সেটা এক অন্ধকার যুগ । মুসলমান রাজত্বের অবসান হয়ে আসছে। ইংরাজ শাসন পাকা হয়নি, চারিদিকেই অরাজকতা, এই পরিস্থিতিতে সম্পন্ন মানুষও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল।
অভয়দায়িনী কালি তখন তাঁদের কাছে সান্ত্বনাস্থল বলে মনে হয়েছিল। সেদিন এইজন্য রাজ্যে শাক্তগীতির বান ডেকেছিল ।
কবি গীতিকারদের মধ্যে অনেক রাজা মহারাজারাও ছিলেন। গীতি প্রাণ অন্য নানারকম লোক তো ছিলেনই।
সব শক্তিগীতিই রাম প্রসাদী সুরে বাঁধা নয়। কালোয়াতি এবং মিশ্র নানা রকম সুরও এখানে আছে ।

কবিগান –

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ বাঙালীর রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সব দিক দিয়েই অবক্ষয়ের কাল । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তখন একমাত্র গানের ক্ষেত্রেই কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ঘটনা ঘটেছিল ।
সেগুলি হল (১) কবি গানের প্রসার (২) পূর্ব ভারতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা (৩) রামনিধি গুপ্তের আবির্ভাব
বাংলার গ্রামাঞ্চলে এবং কলকাতার হঠাৎ বড়লোক অর্ধশিক্ষিত সমাজে একশ্রেণীর গানের তখন খুব আদর হয়েছিল । একে বলত কবি গান। কবিরা বাদ্যযন্ত্র ও সহকারী (দোহার) নিয়ে আসরে এই গান গাইতেন। গানগুলি মুখে মুখে রচনা করে গাওয়া হত।
অধিকাংশ সময়ে দেব দেবী বন্দনা দিয়ে আসর শুরু করা হলেও অনতিবিলম্বে এসে পড়ত বিকৃত আদিরসের প্লাবন ।
পৌরাণিক যে সব প্রসঙ্গে কলহ বা কুৎসার সুযোগ আছে সেগুলি বিষয়ে কবিরা বিশেষভাবে অবহিত থাকতেন ।
যেমন কৃষ্ণরাধার কাহিনীতে নায়ক নায়িকার চেয়ে চন্দ্রাবলী, কুব্জা, বৃন্দাদূতী প্রভৃতির প্রসঙ্গ ছিল অবিরল।
অশ্লীলতা ছাড়া আসর জমত না। দাঁড়া কবি, খেউড়, তর্জা প্রভৃতি প্রকারভেদ ছিল। আখড়াই ও হাফ্ আখড়াই ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত রূপ । এই কবিদের মধ্যেও প্রকৃত কবিত্ব শক্তির স্ফুরণ মাঝে মাঝে দেখা যায় । অন্ততঃ ভাষা ছন্দের ও শব্দালংকারের ওপর আধিপত্য, চটজলদি ছড়া মেলাবার ক্ষমতা, বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর প্রত্যুত্তর, সর্বোপরি পৌরাণিক কাহিনীতে গভীর জ্ঞান এঁদের অনেকেরই ছিল কিন্তু যে প্রতিকূল যুগে তাঁরা জন্মেছিলেন তাতে ঐ সমস্ত গুণের সদ্ব্যবহার হবার কোনও সুযোগ ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা শহরে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এবং রুচিবান সমাজে অন্যবিধ সংগীত চর্চার সঙ্গে সঙ্গে শহরাঞ্চল থেকে কবিরা অপসৃত হন।
কিন্তু পুরো উনবিংশ শতক জুড়ে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এঁরা বিনোদনের উপকরণ জুগিয়ে এসেছেন। এঁদের কবিতাযুদ্ধের একটা মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য চিত্র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি উপন্যাসে পাওয়া যায় ।

বাংলায় উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা –

অষ্টাদশ শতকের শেষে দিল্লি দরবারের ক্ষমতা ক্ষীণ হয়ে গেলে সেখানকার গুণীজনেরা অন্যান্য প্রদেশে গিয়ে সাধনা ও শিক্ষাদানে রত হন। এইভাবে প্রথমে বিহার এবং উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা শহরে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের কতকগুলি কেন্দ্র গড়ে উঠে।
কলকাতায় ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এককালে যেমন অনেকে কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, সেই রকম শিক্ষাবিস্তার ও বদলের পরে অনেকেই উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চায় উৎসাহ দিতেলাগলেন। গীতবাদ্যের জ্ঞান অভিজাত পুরুষের অন্যতম লক্ষণ বলেও বিবেচিত হল, বিশিষ্ট গায়কেরা অভিজাত ধনীগৃহে সমাদরের জায়গা পেলেন, যেমন ঠাকুরবাড়ীতে একসময় ছিলেন যদুভট্ট। এদের থেকে পাওয়া শিক্ষা যেমন একদিকে বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানী সংগীতের কিছু সাধক তৈরী করেছিল কিন্তু তার থেকেও বেশী প্রবল হয়েছিল এঁদের পরোক্ষ প্রভাব। উচ্চাঙ্গ সংগীতের সুরধারা সম্পূর্ণ আত্মস্যাৎ করে নিয়ে, অতিরিক্ত জ্ঞানবাহুল্য বা অন্য অলংকার বর্জন করে শুদ্ধ বা মিশ্র রীতিতে বাংলার কাব্যগীতি তৈরি হতে লাগল। এই ধারাই রূপান্তরিত হতে হতে আজও চলেছে ।

রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) –

নিধুবাবু (১৭৪১- ১৮৩৮) বাংলা কাব্যসংগীতস্রষ্টাদের মধ্যে প্রথম সারিতে স্থান পাবার যোগ্য । তিনি যেকালে জন্মেছিলেন তখন না ছিল আজকের প্রচারমাধ্যম , না ছিল রেকর্ডে সহায়তা। তবুও জীবৎকালে তিনি যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন আজ তা বড় গায়কদেরও ঈর্ষা উদ্রেক করবে। নিধুবাবুর হাতেই আমাদের দেশের প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ প্রণয় সংগীত তার সমস্ত বেদনা ও ব্যাকুলতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যে গীতরীতির দ্বারা তিনি এটা করেছিলেন তার নাম টপ্পা । বিশেষজ্ঞেরা বলেন টপ্পা আদিতে পশ্চিমভারতীয় লোকসংগীতের প্রকার বিশেষ ছিল। তাকে ধ্রুপদী সংগীতের অঙ্গ করে তুলেছিলেন শোরী মিঞা (আসল নাম গোলাম নবী) নামক এক বিহারী শিল্পী। নিধুবাবু কর্মোপলক্ষে দীর্ঘদিন বিহারে ছিলেন এবং সেখান এই গান তিনি শিখেছিলেন। তারপর তিনি এই রীতি আপন ভাষায় প্রয়োগ করলেন। নিধুবাবু সেকালে কবিয়ালদের রীতিতে অতি দ্রুত গান রচনা করতে পারতেন। বস্তুতঃ কবিগান, আখড়াই গান এসবও তিনি অনেক লিখেছেন। টপ্পার জন্য তিনি লিখলেন প্রণয়ের কবিতা । কবিতাগুলি সরল অথচ গভীর এবং তাঁর সুরের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিধুবাবু পশ্চিমি টপ্পাকে হুবহু অনুসরণ করলেন না। সেখানে তানের কাজ খুব দ্রুত হত। নিধুবাবু সেখানে এমন একটি ধীর আন্দোলনের ভাব নিয়ে এলেন যে গানের কথার মধ্যে যে অর্থব্যঞ্জনা অস্ফুট ছিল তা এক অপরূপ হৃদয় বেদনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল । কণ্ঠসঙ্গীতে কথা না সুর কার প্রাধান্য বেশি এ বিতর্ক খুব পুরানো। কোনো কোনো গানের, যেমন খেয়াল প্রভৃতি হিন্দুস্থানি মার্গসংগীতের, কথা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। রাধা হোলিত্রিড়ারত শ্যামকে বলছেন তোমার রঙে আমার উত্তরীয়টি রাঙিয়ে দাও-- মাত্র এই বাক্যটির দু ছত্র ঘিরে তান বিস্তারে পুঞ্জে পুঞ্জে সুর ঘনিয়ে ওঠে। কথা একেবারেই উপলক্ষ্য হয়ে যায়। আবার মধ্যযুগের পাঁচালি কিংবা একালের গণসংগীতে কথাটা বলাই আসল। সুর সেখানে অনেক পিছনের সারির জিনিস। কিন্তু প্রকৃত কাব্যসংগীতে কথা ও সুরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকা চাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "এমনতর পরিণয়ে (কথা ও সুরের যোগ) পরস্পরের মন জোগাবার জন্য উভয় পক্ষেরই নিজের জিদ কিছু কিছু না ছাড়লে মিলন সুন্দর হয় না।" এখন এই কথা ও সুর নিজ নিজ দাবীকে কতটা ছাড়বে সেই পরিমিতিবোধ খুব সূক্ষ্ম অনুভূতির বিষয়। যদি গীতিকার ও সুরকার একই লোক হন তাহলে সে কাজ সহজ হয়। তার ওপর তিনি যদি নিজে গাইতেও পারেন এবং নিজের গানের প্রথম গায়ক হিসাবে এর পরিবেশনের একটা দিকনির্দেশ করে দিতে পারেন তাহলে তো মনিকাঞ্চন যোগ। নিধুবাবুর ক্ষেত্রে এই দুর্লভযোগসাজশ ঘটেছিল। এইদিকদিয়ে তিনি পরবর্তীকালের গীতিকার-সুরকার-গায়ক কবিকুল রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল , রজনীকান্ত , দিলীপ রায় থেকে আজকের সুমন নচিকেতা পর্যন্ত ধারার অগ্রদূত। উদাহরণ স্বরূপ নিধুবাবুর একটি গান উদ্ধৃতকরা গেল --

তারে ভুলিব কেমনে প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে ।
আর কি সে রূপ ভুলি প্রেমতুলি করে তুলি হৃদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে ।.......
সে দিন ভুলিব তারে যে দিন লবে শমনে ।

নিধুবাবুর ধারায় শ্রীধর কথক, হর ঠাকুর, কালী মির্জা প্রভৃতি অসংখ্য গীতিকার সুরকারের উদয় হয়েছিল। সেকালের ইতিহাস সচেতনতার অভাবে একের গান অন্যের নামে চলিত হয়ে গেছে এমন বহু উদাহরণ মেলে ।

ব্রহ্মসংগীত –

বাংলা গানের ইতিহাসে ব্রহ্মসংগীতের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে । ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই উপলক্ষে প্রচলিত সংস্কৃত স্তবগানের পাশাপাশি তিনি বাংলা গানও লেখেন এবং এই জাতীয় সংগীতের নাম দেন ব্রহ্মসংগীত। সেই থেকে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় এবং পরে ব্রাহ্মভাবাপন্ন পরিবারে এইধরণের গানের চর্চা হত। এগুলি দেবদেবীপ্রসঙ্গ বর্জিত আধ্যাত্মিক ভাবের গান। অধিকাংশই পরমেশ্বরের বন্দনা গান। মার্গসংগীত বিশেষতঃ ধ্রুপদের আঙ্গিকে এইসব গান তৈরি হত। তবে কীর্তন,পল্লীগীতি প্রভৃতির অনুসরণে সুরসৃষ্টিও কম ছিল না। সেকালে ব্রাহ্মসমাজের বাইরেও অনেকে ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন। পরে রবীন্দ্রনাথ বহু ব্রহ্মসংগীত লিখেছেন। বিষয় ও সুর দুদিক দিয়েই সমসাময়িক রুচিকে উন্নত ও পরিশীলিত করার কাজে ব্রহ্মসংগীতের যথেষ্ট অবদান আছে । রামমোহন রায় রচিত একটি ব্রহ্মসংগীতের উদাহরণ নিম্নরূপ ---

ভাবো সেই একে জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার আদি অন্ত নাহি যার সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাকে ।।

সেকালের শ্রোতা –

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার গানের ভাণ্ডারে যে সম্পদ জমে উঠেছিল তাদের মোটামুটি পরিচয় এ পর্যন্ত দেওয়া হল। এই পর্যায়ে এসে আমরা যদি একটু ভিন্নতর প্রসঙ্গে ঘুরে আসি তাহলে মন্দ হয়না । সে প্রশ্নটি হল এ গানের শ্রোতা কারা ছিল । আজকের দিনে ইচ্ছা থাকলে নিজের ঘরে নিভৃতে বসে যে কোনো লোক তার পছন্দের গান শুনতে পারে। সেকালে তা কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। গায়কের সামনে বসে শ্রোতাকে গান শুনতে হত। শ্রোতার সমঝদারির ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে হত গায়ককে। অপরদিকে শ্রোতাও গান শোনার জন্য তৈরি হয়ে বসতেন ও মন দিয়ে শুনতেন। অন্য পাঁচটা কাজের ফাঁকে ফাঁকে আজকের

দিনে চতুর্দিক থেকে ধ্বনীত গান যেমন আমাদের কানের ওপর দিয়ে মনের ওপর দিয়ে পিছলে বেরিয়ে যায় সে রকম অর্ধমনস্কভাবে গান শোনবার কোনো উপায় ছিলনা। মোটের ওপর গান সেদিন দুর্লভ ছিল বলে তার দামও বেশি ছিল।

শিক্ষিত অভিজাত ধনীগৃহে পুরুষেরা সংগীত শিক্ষা করতেন এবং ভালো গানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁদের আয়োজিত আসরে সমশ্রেণীর পুরুষেরই শুধু প্রবেশাধিকার থাকত। গ্রামাঞ্চলে সর্বসাধারণের বিনোদনের জন্য ছিল যাত্রা পাঁচালি কথকতা এবং অবশ্যই কবিগান। কীর্তন ও শ্যামা বিষয়ক গানও চালু ছিল। এইসব পেশাদার সাধারণ গায়কের মুখে মুখে নিধুবাবু ও তদনুসারী গীতরচয়িতাদের গান বাংলার সর্বত্র ছড়িয়েপড়েছিল। বিশেষ কয়েকটি সম্প্রদায় ছাড়া মেয়েদের গান গাইবার চলন ছিল না।

শেখা শোনা এবং গাওয়া এতরকম বাধা বিঘ্নের মধ্যেও গান সম্বন্ধে সাধারণ বাঙালীর আগ্রহ ছিল ব্যাপক। কি কি ধরণের গান তখন চলত, কি ভাবে তা লোকের কাছে পৌঁছত তার বিবরণ ইতিহাসে না থাকলেও সেকালের গল্প উপন্যাসে ধরা আছে। বিষবৃক্ষ (রচনাকাল ১৮৭২) থেকে একটা ছোট কৌতুকজনক উদাহরণ দেওয়া যাক।

নগেন্দ্র দত্ত গোবিন্দপুরের জমিদার। তাঁর অন্তঃপুরে অসংখ্য আশ্রিতা কুটুম্বিনীদের মধ্যে কুন্দনন্দিনী একজন। এই কুন্দকে দেখবার জন্য অপর এক দুশ্চরিত্র জমিদার দেবেন্দ্র দত্ত বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশে সেখানে দুপুরবেলায় ঢুকেছে। পরবর্তী বর্ণনা এই প্রকার - ‘‘বৈষ্ণবী কহিল - ‘আমার নাম হরিদাসী বৈষ্ণবী। মা ঠাকুরানীরা গান শুনবে।’ তখন ‘শুনবো গো শুনবো’ এই ধবনি চারি দিকে আবালবৃদ্ধার কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে লাগিল তখন খঞ্জনী হাতে বৈষ্ণবী উঠিয়া গিয়া ঠাকুরানীদিগের কাছে বসিল। কুন্দ অত্যন্ত গীতপ্রিয়, বৈষ্ণবী গান করিবে শুনিয়া সে তাহার আর একটু সন্নিকটে আসিল।... বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল ‘কি গায়িব?’ তখন শ্রোত্রীগণ নানাবিধ ফরমাশ আরম্ভ করিলেন। কেহ চাহিলেন ‘গোবিন্দ অধিকারি, কেহ ‘গোপাল উড়ে’। যিনি দাশরথির পাঁচালি পড়িতেছিলেন তিনি তাহাই কামনা করিলেন। দুই একজন প্রাচীনা কৃষ্ণবিষয় হুকুম করিলেন। তাহারই টীকা করিতে গিয়া মধ্যবয়সীরা সখীসংবাদ এবং বিরহ বলিয়া মতভেদ প্রচার করিলেন। কেহ চাহিল ‘গোষ্ঠ’। কোনও লজ্জাহীনা যুবতী বলিল ‘নিধুর টপ্পা গাইতে হয় তো গাও, নহিলে শুনিব না’। একটি অস্ফুটবাচা বালিকা বৈষ্ণবীকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে গাইয়া দিল ‘তোলা দাস্‌নে দাস্‌নে দাস্‌নে দূতি’। অতঃপর বৈষ্ণবী কুন্দের অনুরোধে দুটিকীর্তন, এবং সূর্যমুখীর মনোরঞ্জনের জন্য একটি শ্যামাবিষয় গাইবার পর আসর ভেঙে গেল। প্রস্থানোদ্যত ছদ্মবেশী বৈষ্ণবী তখন খঞ্জনীতে মৃদু মৃদু খেমটা বাজাইয়া মৃদু মৃদু গাইতে গাইতে গেল - ‘আয়রে চাঁদের কণা / তোরে খেতে দিব ফুলের মধু পরতে দিব সোনা।’ ’’

থিয়েটারের গান –

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হলে বাংলা গানের জগতেও তার প্রভাব পড়ল। টিকিট কেটে সাধারণ লোক থিয়েটার দেখতে আরম্ভ করলে থিয়েটার ও সাধারণ লোকের চিত্ত অনুযায়ী চলতে লাগল। আমাদের দেশে গীত প্রধান যে যাত্রা পাঁচালির ধারা আবহমান কাল ধরে প্রচলিত ছিল তার সঙ্গে ছিল সাধারণ মানুষের নাড়ির যোগ। সেই অন্তঃশীল চাহিদার ফলে বাংলা নাটকে গানের আধিক্য দেখা দিয়েছে। সামান্যতম সুযোগ পেলেই নাট্যকারেরা সেই ফাঁকে একটি করে গান গুঁজে দিতেন। তাছাড়া গীতিনাট্য তো ছিলই। সেকালে না ছিল প্লেব্যাক, না ছিল মাইক। তাই জোরালো সুকণ্ঠের অধিকারীকে শুধু গান গাইবার জন্যই কোন একটা ভূমিকা তৈরি করে থিয়েটারে ঢুকিয়ে নেওয়া হত। সেকালের বিখ্যাত গায়িকা আঙুরবালার স্মৃতিকথা থেকে জানা যাচ্ছে যে নিতান্ত বালিকা বয়সেই এইরকম করে তিনি বিবেকের ভূমিকায় থিয়েটারে গান করেছিলেন। থিয়েটারের গানে প্রচলিত সংগীতরীতির সবগুলি থেকেই নাট্যকারেরা উপাদান সংগ্রহ করতেন। এই সব গানে স্বভাবতঃই ভালো মন্দ মাঝারির শ্রেণীবিভাগ ছিল। তবে গীতরীতিতে বড় ধরণের মৌলিকতা না দেখালেও থিয়েটারের গান অন্য আর একদিক দিয়ে বাংলা গানের পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছে। সেটা হল বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য। নাটকের প্রয়োজনে প্রণয়সংগীত, ভক্তিগীতি, দেশাত্মবোধক গান, চটকদার রংতামাশার গান, বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী আনুষ্ঠানিক গান অজস্র দেখা দিল। আপামর জনসাধারণের থিয়েটার দেখার অধিকার ছিল, এমনকি মেয়েদেরও। থিয়েটার বাহিত হয়ে সেকালের সবরকম গান তাই সহজেই বাঙালীর ঘরে ঘরে ঢুকে গেল। এই সবের মধ্যে দিয়েই আমরা চলে আসি উনবিংশ শতকের শেষ পর্বে। ততদিনে বাংলা গানের আকাশে অগোচরে একটি জ্যোতিষ্মান নক্ষত্রের আবির্ভাব হয়েছে। তার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্র সংগীত –

সংগীতের পরিমন্ডলে রবীন্দ্রনাথ বড় হয়েছিলেন। ‘‘তখন আমাদের বাড়িতে গানের চর্চার বিরাম ছিল না। বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন সংগীতের আচার্য, হিন্দুস্থানী সংগীতকলায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন। অতএব ছেলেবেলায় যে সব গান সর্বদা আমার শোনা ছিল সে সখের দলের গান নয়। তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা আপনি জমে উঠেছিল। রাগ রাগিনীর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে যাঁরা অত্যন্ত শুচিবায়ুগ্রস্ত তাদের সঙ্গে আমার তুলনাই হয়না - কিন্তু কালোয়াতি সংগীতের রূপ এবং রস সম্বন্ধে একটা সাধারণ সংস্কার ভিতরে ভিতরে আমার মনের মধ্যে পাকা হয়ে উঠেছিল।... গানের প্রতি আমার নিবিড় ভালোবাসা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল তখন অবিমিশ্র সংগীতের রূপ সে রচনা করলে না, সংগীতকে কাব্যর সঙ্গে মিলিয়ে দিলে।
কোনটা বড় কোনটা ছোট বোঝা গেল না।’’ (সংগীত)

পাশ্চাত্য সংগীত তাঁর একেবারে না শোনা ছিল না, কারণ বাড়িতে সে গানেরও চর্চা ছিল। তাছাড়া একেবারে বালক বয়স থেকেই সুরে কথা বসানো এবং কথায় সুর বসানো এই দুরকম কাজেই তিনি পাকা হয়েছিলেন।

"এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাহার অঙ্গুলি নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুর বর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু (অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী) তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল" । (জীবনস্মৃতি)

তারপর সারাজীবন তাঁর গীতধারা কখনো থামে নি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর গানগুলিকে কালানুক্রমিক সাজালে তার মধ্যে তাঁর অন্তরাত্মার সম্পূর্ণ ইতিহাসটি ফুটে ওঠে। হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে যেখানে অন্তর্যামী জেগে আছেন সেখানকার গহন সুখদুঃখের, আত্মার গোপন সংগ্রাম ও শান্তির প্রতিটি স্পন্দন সেখানে ধরা আছে । রবীন্দ্রগীতির বিষয়বস্তুগত শ্রেণীবিভাগ, আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য, তাঁর গানের ওপর অন্যতর গানের প্রভাব, অন্য গানের ওপর তাঁর প্রভাব, তাঁর সুরে দেশি বিদেশি নানা উপাদানের সমন্বয়, তাঁর নাট্যগীতি, কবিতা ভাঙা গান, গদ্যছন্দের গান, তাঁর শিক্ষাদর্শে গানের স্থান ইত্যাদি অসংখ্য দৃষ্টিকোণ থেকে মনস্বী ব্যক্তিরা বহুবিধ আলোচনা করেছেন। তাঁর সংগীত বিষয়ক গবেষণা নিয়ে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তাই এই প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে অনেক দরকারী কথাই বাদ পড়ে যাবে । অতি সংক্ষেপে তাঁর গানের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যাক।

(১) ভারতীয় মার্গসংগীত, পাশ্চাত্য সংগীত, কীর্তন, পল্লীসংগীত প্রভৃতি সবরকম উৎস থেকেই তিনি তাঁর গানের সুর সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু শুধু সুরের কাঠামোটুকু নিয়েছেন মাত্র। যেমন হিন্দুস্থানী গানের তানকর্তব বা কীর্তন গানের আখর তাঁর গানে নেই। প্রয়োজনবোধে তিনি বিভিন্ন উপাদান মিশিয়েও নিয়েছেন ।

(২) আগেকার বাংলা গানে দুটি ভাগ থাকত - অস্থায়ী ও অন্তরা। কখনো কখনো একাধিক অন্তরা। রবীন্দ্রনাথের গান আকারে ধ্রুপদাঙ্গ। ধ্রুপদের মত এখানে চারটি তুক আছে অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। এর মধ্যে অন্তরা ও আভোগের সুর সাধারণতঃ একরকম ।

(৩) গীতবিতানে তাঁর গানগুলিকে বিষয়ানুসারে পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক -এই ভাগ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীবিভাগ না করলে ব্যবহারের অসুবিধা হয় বলেই এরকম করা। তা না হলে রবীন্দ্রনাথের বেশীর ভাগ গানেরই বিষয়বস্তু অনির্দিষ্ট। প্রেমপর্যায়ের গান অনায়াসেই পূজাপর্যায়ে বা প্রকৃতির গান অনায়াসে প্রেম পর্যায়ে স্থান পেতে পারে। আসলে দু-চারটি ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁর বেশির ভাগ গানই মিশ্র অনুভূতিনির্ভর ।

(৪) রবীন্দ্রগীতে কথার গুরুত্ব খুবই বেশী। যার জন্য সুকুমার সেনের মত মনস্বী ব্যক্তিরও মনে হয়েছিল তাঁর গানগুলি আসলে কবিতাই। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি সুস্পষ্ট মত ছিল। তিনি মনে করতেন যে গানে যে মনোভাবটি তিনি ব্যক্ত করতে চান তার সূত্রপাত কথায়। কিন্তু সুর ছাড়া সে কথা অসম্পূর্ণ। "এ দেশে গান ... বাক্যের অনুবর্তন করিবার ভার লইয়া বাক্যকে ছাড়াইয়া যায়। গান রচনা করিবার সময় এইটে বারবার অনুভব করা গিয়াছে। গুণ গুণ করিতেকরিতে যখনই একটা লাইন লিখিলাম 'তোমার গোপন কথাটিসখী রেখো না মনে' তখনই দেখিলাম সুর যে জায়গায় কথাটা উড়াইয়া লইয়া গেল কথা আপনি সেখানে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া পৌঁছিতে পারিতনা। তখন মনে হইতে লাগিল আমি যে গোপন কথাটি শুনিবার জন্য সাধাসাধি করিতেছি তাহা যেন বনশ্রেণীর শ্যামলিমার মধ্যে মিলাইয়া আছে। ... তাহা যেন সমস্ত জল স্থল আকাশের নিগূঢ়গোপন কথা। ... এই কারণে চিরকাল গানের বই ছাপাইতে সংকোচবোধ করি। কেননা গানের বহিতে আসল জিনিসই বাদ পড়িয়া যায়।" (জীবনস্মৃতি)

(৫) এই 'আসল জিনিস' কতটুকু পাওয়া গেল তারই ওপর নির্ভর করে রবীন্দ্রসংগীতের উপভোগ্যতা এবং সেইখানেই রয়েছে এই গানের সবচেয়েবড় বিপদ। গান মাত্রই ব্যক্ত হবার জন্য গায়কের কন্ঠের অপেক্ষা রাখে। সেই গায়ক যেমন তাতে প্রাণ দিতে পারেন তেমনই প্রাণ নিতেও পারেন। কীর্তন, শ্যামাবিষয়, কিংবা নিধুর টপ্পার মত গানে কথার সৌন্দর্য আছে। কিন্তু সে কথা আধুনিক কবিতার ব্যঞ্জনাধর্মী কথা নয়। তার অর্থ পরিষ্কার এবং ঐ সব গানের সুর একটা নির্দিষ্ট শক্তপোক্ত কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এক্ষেত্রে গায়ক যদি কথা ও সুর যথাযথ রেখে গান করেন তাহলে তা উতরে যায়। তার ওপর তিনি যদি সুকন্ঠের অধিকারী হন তো সোনায় সোহাগা। রবীন্দ্রসংগীতের এত স্পষ্ট অর্থ হয়না। তাঁর কবিতার মত গানেও আপাত সরল কথার তলায় একটি অন্তঃস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। তাঁর জীবনব্যপী আত্মানুসন্ধান ও ক্রমাগত নিজেকে উত্তীর্ণ হবার প্রয়াস কথা ও সুরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। গায়কও শ্রোতার জীবনে এই গভীর স্তরবিন্যাস সমন্ধে যদি চেতনা না থাকে তাহলে এ গানের পরিবেশন বা রসগ্রহণ কোনটাই ভালো হবে না। তাই কথা ঠিক আছে, সুরও স্বরলিপিসম্মত, গায়ক বা গায়িকার গলাটিও মিষ্টি তবু ও গান নিষ্প্রাণ ও একঘেয়ে লাগছে এমন ঘটনা রবীন্দ্রসংগীতে হামেশাই ঘটে।

(৬) রবীন্দ্রসংগীত দাঁড়িয়ে আছে অতি সূক্ষ্মসামঞ্জস্যবোধের উপর। তাই শুধু কথা ও সুর নয় উচ্চারণ, স্বরক্ষেপণ, লয়, যথাস্থানে বিরতি যে কোনও একটির ত্রুটিতে পুরো গানের আবহ নষ্ট হয়ে যায় যা আর কোনো গানে হয় না। 'আলো আমার আলো ওগো আলো ভুবন ভরা' আনন্দ ও উদ্দীপনার গান। এটিকে গাইতে হবে প্রতি বাক্যাংশে ঝোঁক দিয়ে কাটা কাটা উচ্চারণে ও দ্রুত লয়ে। অথচ প্রায়ই দেখা যায় ধীর লয়ে গোলালো উচ্চারণে মধুর করে এই গান গাওয়া হচ্ছে। শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ একবার কোনও অনুষ্ঠানে দুরকম করেই গানটি গেয়ে দেখিয়ে দিলেন দ্বিতীয়টি কত শূন্যগর্ভ। আবার উল্টোটাও হয়। 'এই করেছ ভালো নিঠুর হে' গানটি কোনো গায়ক হয়ত এমন একটা ভঙ্গীতে গাইলেন যে 'এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো' শুনে মনে হল সেটা কতই না আনন্দের ব্যাপার। যে শ্রোতার মনের গভীরে সুখ-দুঃখের কোন সঞ্চয় নেই সে কি করে বুঝবে চিত্তবীণার তারে সপ্তসিন্ধু দশদিগন্তের ঝংকার কাকে বলে ।

এই সব কারণে রবীন্দ্রসংগীত একদিকে যেমন সহজ অপরদিকে তেমনই কঠিন। এর প্রচার ও ব্যবহার যেমন ব্যাপক এর বিকৃতিও ততোধিক।

৭) কিন্তু এ সব বাধা পার হয়ে রবীন্দ্রসংগীত যেখানে তার প্রার্থিতরূপে আগ্রহী শ্রোতার কাছে পৌঁছায় সেখানে তা এক অমূল্য অভিজ্ঞতা "গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখিভুবনখানি / তখন তারে চিনি তখন তারে জানি" একথা শ্রোতার জীবনে সত্য হয়ে ওঠে। সৌভাগ্যবশঃ রবীন্দ্রনাথ বরাবরই তাঁর গান রচনাকালে এইরকম কিছু লোকের সংসর্গ ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন। প্রথম দিকেছিলেন তাঁর বাড়ির লোকজন ও বন্ধুবান্ধবেরা। পরে শান্তিনিকেতন আশ্রমের আবাসিক ও পরিচিতজন। শেষের দিকে তিনি গান তৈরি করবার সঙ্গে সঙ্গে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেটি গলায় তুলে নিতেন ও স্থায়ী করে রাখতেন। এইভাবে তাঁর গানের শুদ্ধ রূপ অনেকটাই রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত একটিছোট গন্ডীর বাইরে রবীন্দ্রসংগীতের বিশেষ কোন পরিচিতি ছিল না। সুরের তথাকথিত শুদ্ধতা না থাকায় ওস্তাদেরা তাঁর গানকে অবজ্ঞা করতেন এবং সাধারণ মানুষও তাঁর গান বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। অনেক পরে রেকর্ড ও চলচ্চিত্রের দ্বারা পঙ্কজ মল্লিক তাঁর গানকে সাধারণ্যে আনেন এবং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বেশ কিছু গুণী শিল্পী এই গানের জগতে আসেন যাঁদের উপলব্ধিতে গভীরতা ছিল এবং কণ্ঠে ছিল সেই উপলব্ধিকে ব্যক্ত করবার সামর্থ্য। তাঁদের দ্বারা এই গানের ব্যাপক প্রসার হয়েছে। নবীন শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁদের গানে হৃদয়ের বন্ধদুয়ার খুলে যায়। আবার অনেকেই আছেন যাঁদের সম্পর্কে বিপরীতটাই সত্য

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় –

উনবিংশ শতকের শেষ প্রহর এবং বিংশ শতকের সূচনাকাল বাংলা কাব্যগীতির ইতিহাসে সমৃদ্ধির কাল। গানের রবীন্দ্রনাথ তখনো অগোচরে রয়েছেন এবং তাঁর বেশিরভাগ ভালো গান তখনও অরচিত। কিন্তু তারই মত গীতশিল্পী বেশ কয়েকজন দেখা দিলেন। এঁদের মধ্যে সবার আগে নাম করতে হয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩)। দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের ছেলে তিনি। তাঁর রক্তেই ছিল সঙ্গীত প্রতিভা। পারিবারিক নিয়মে অল্প বয়সেই ভারতীয় মার্গসংগীতের এবং বাংলা কাব্যসংগীতের শিক্ষা তাঁর পাকা হয়েছিল। কিন্তু ঐখানে তিনি থেমে রইলেন না। বিলেতবাসের সুবাদে পাশ্চাত্য সংগীত শিখে বাংলা গানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সুরের সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করলেন। এটা শুধু পশ্চিমি সুরে বাংলা কথা বসানো নয়, প্রাচ্য মেলডির সঙ্গে পাশ্চাত্য হার্মনির সমন্বয় প্রয়াস। নানারকমের গান তিনি লিখেছেন। দেশাত্মবোধক, প্রণয়গীতি, হাসির গান প্রভৃতিভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার সুরের ব্যবহার তাঁর প্রয়াগ নৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছে। গানগুলি কবিতা হিসাবেও উচ্চাঙ্গের। কারণ বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্য এবং নাটক রচনাতেও পারদর্শী ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রগীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য তার ওজস্বিতা, অপর বৈশিষ্ট্য সুরের সূক্ষ্মকাকার্য। তাঁর স্বদেশী গানের ওজস্বিতা এবং প্রণয় ও ভক্তিগীতিতে সূক্ষ্ম সুরবিহারের প্রাধান্য, আর হাসির গানে আছে সুর নিয়ে যথেচ্ছ খেলা করার আশ্চর্য দক্ষতা। খুবই দুঃখের বিষয় যে দ্বিজেন্দ্রলালের সিরিয়াস গানগুলির চর্চা থাকলেও তার হাসির গানগুলি অবহেলিত হয়ে আছে।

রজনীকান্ত সেন –

রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) দিজেন্দ্রলালের মতই স্বদেশী গান, প্রেমের গান, হাসির গান, এবং ভক্তিগীতি সবই লিখেছেন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যে গানে সবচেয়ে বেশি করে ফুটে উঠেছে সেগুলি সবই ভক্তিগীতি। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের কথায় যে কাব্যসৌন্দর্য আছে রজনীকান্তের তা নেই। তার গানের কথাগুলি খুবই সাদামাটা, কিন্তু সুরসংযোগে সেগুলির রূপ পালটে যায়, ভগবৎচরণে তাঁর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের বেদনা আমাদের স্পর্শ করে। সেদিক দিয়ে প্রকৃত কাব্যগীতির লক্ষণ, অর্থাৎ কথার অন্তর্নিহিত ভাবচিত্রকে সুর অনেকদূর অবধি প্রসারিত করে দিল সেটাই আমরা তাঁর গানে লক্ষ্য করি। তাঁর এই গানগুলির চর্চা আছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মত তাঁরও হাসির গানগুলি অব্যবহারে লুপ্ত হতে বসেছে।

অতুল প্রসাদ সেন –

লক্ষ্ণৌ শহরের সেকালের সংগীতিক পরিমণ্ডলে অতুলপ্রসাদ (১৮৭১-১৯৩৪) গানের চর্চা করেছেন।

হয়ত সেইজন্যই তাঁর বেশিরভাগ গানে একটা শুদ্ধ রাগরূপ চোখে পড়ে। তবে কোনোখানেই তা তান বিস্তারে বা কারুকার্যে উদ্বেল নয়। একটা শান্ত সমাহিত ভাব তাঁর গানে আছে। তিনিও স্বদেশি গান, প্রণয়ের গান এবং ভক্তির গান লিখেছেন। মার্গ সংগীতের সুরের পাশাপাশি কীর্তন বা বাউলের দেশজ সুর এবং ক্ষেত্র বিশেষে পাশ্চাত্য সুরও ('উঠগো ভারতলক্ষ্মী, উঠ আদি জগতজনপূজ্যা') তিনি ব্যবহার করেছেন। তাঁর গানের জনপ্রিয়তা এখনও অব্যাহত। দ্বিজেন্দ্র, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ এই তিন সংগীতস্রষ্টার মধ্যে কতকগুলি মিল আছে।

(১) এঁদের প্রত্যেকের গানে এমন একটা নিজস্ব ভঙ্গী আছে যাতে আগে থেকেনা জানা থাকলেও শোনামাত্র বলে দেওয়া যায় কার গান

(২) রবীন্দ্রনাথের মত এঁদের গান ধ্রুপদাঙ্গ নয়। অর্থাৎ একটিঅস্থায়ী এবং একবা একাধিক অন্তরায় তাঁদের গানগুলি স াজানো। সামান্য ব্যতিক্রম থাকলেও এটাই মূল গঠন।

(৩) রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে গায়ককে সুরবিহারের স্বাধীনতা দেবার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন । দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে তার পত্রালাপ থেকে জানা যায় যে দিলীপকুমারের মত গুণী শিল্পীর বহু অনুরোধেও তিনি তাঁর এ নীতি থেকে একচুল নড়েন নি।
আলোচ্য তিন সংগীতকার গায়ককে সে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। ফলে অল্পবিস্তর পার্থক্যসহ এঁদের একই গানের একাধিক রূপ প্রচলিত আছে।
(৪) তাতে এঁদের গানের মৌলিকরসাবেদন ক্ষুণ্ণ হয়নি এবং এইখানেই রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে তাঁদের গানের আসল তফাৎ। তাঁদের গানে কথা ও সুর রবীন্দ্রসংগীতের মত অতটা অনন্য নির্ভর নয়। গানের কথার সঙ্গে মোটামুটি সঙ্গতি রেখে সুর তার নিজের নিয়মে কারুকার্যখচিত হয়ে উঠেছে সেটাই এ গানের শক্তি। এজন্য রবীন্দ্রসংগীতের চেয়ে এ গান অনেক বেশী ঘাতসহ। এ কথা সত্য যে দিলীপকুমার রায়ের গলায় দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদ রজনীকান্তের গান যে ভাবগাম্ভীর্য ও ভাবগভীরতা নিয়ে প্রকাশ পাবে সাধারণ মানের গায়কের গলায় অবশ্যই তা পাবে না, কিন্তু একেবারে নষ্টও হয়ে যাবে না। ঠিক এই কথাটিই আরও বেশি করে খাটে নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে। তাঁর গানও ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত। কিন্তু হাজার স্থুল হস্তাবলেপ সত্বেও তাঁর গান মোটামুটি দাঁড়িয়ে যায় কারণ তার ভাব সরল এবং সুর নানা অলংকারে হৃদয়গ্রাহী। তাঁর গানের জনপ্রিয়তার এটাই চাবিকাঠি। নজলের গান বাংলার গৌরব ।
তবে তার আলোচনার আগে বিংশ শতাব্দী সূচনায় যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমাদের সংগীত জগতকে আমুল বদলে দিল তার কথাটি বলে নেওয়া যাক।

সুখী গৃহকোণ, শোভে গ্রামোফোন –

উনিশশো দুই খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি লন্ডন থেকে হড্ সাহেব ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলকাতায় ধ্বনিমুদ্রিকা যন্ত্র (গ্রামোফোন) নিয়ে পদার্পণ করলেন। এই ঘটনাটির সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য সেদিন কেউ বুঝতে পারেন নি। আজ পিছনে ফিরে তাকালে বোঝা যায় সংগীতের ইতিহাসে বিংশ শতক শুধু এই যন্ত্রটির কারণেই তার আগেকার হাজার বছরের চেয়েও গুত্বপূর্ণ। গান রেকর্ড হতে থাকার ফলাফলগুলি সংক্ষেপে এই রকম হয়েছিল ।
(১) এতদিন থিয়েটার বাঈজি বাড়ি অথবা আসর ছাড়া গান শুনতে পাবার কোনো উপায় ছিল না। এখন ডিস্কবাহিত হয়ে সব রকম গান সোজা বাঙালীর অন্তঃপুরে ঢুকে গেল ।
(২) গ্রামোফোন কোম্পানী ব্যবসা করতেই এদেশে এসেছিল এবং সে ব্যবসা মোটামুটি সচ্ছল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত সমাজে - যারা গ্রামোফোন ও রেকর্ড কিনবার শখ ও সঙ্গতির অধিকারী। ফলে যে সব গান সর্বজনগ্রাহ্য এবং ছোট-বড় নির্বিশেষে বাড়ির সবাই একসঙ্গে বসে শুনতে পারে সেইরকম গানই তারা প্রথমে রেকর্ড করেছিল। উদ্দিষ্ট শ্রোতা ও ক্রেতার কথা ভেবেই তাই তারা গানের ভাব-ভাষায় একটা সুচিমান রক্ষা করার বাধ্যবাধকতা মেনে চলত। ক্রমে নাগরিক শিক্ষিত সমাজে কবিগান পর্যায়ের সংগীত একেবারে উঠে গেল এবং তারই বিকল্পে গৃহস্থের ঘরে এল গমোফোন।
(৩) এই প্রথম সংগীত সংরক্ষণের উপায় হল। এতদিন গান ছিল শ্রুতি ও স্মৃতিবাহিত পরম্পরা। তাতে দেশ কাল ও ব্যক্তিবিশেষে গানের চেহারা পালটে যেত। এখন রেকর্ডে তার যে রূপটি বাঁধা পড়ল এর পর স্বেচ্ছাচারিতার অবকাশ গেল কমে ।
(৪) আগেকার কালের গীতস্রষ্টারা যেমন রামপ্রসাদ কি নিধুবাবু কিংবা হরঠাকুর, শ্রীধর কথকেরা কিভাবে তাঁদের গান গাইতেন বা গাওয়া হোক বলে চাইতেন তা আমরা জানি না। কিন্তু এখন থেকে নিজ গানের পরিবেশনা প্রণালী সম্বন্ধে গীতকারকদের কি অভিপ্রায় তা আমরা মোটামুটি জানতে পারলাম ।
(৫) কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সংগীতরুচি যন্ত্রানুষঙ্গ ও গায়কী কিভাবে পালটে যায় তার পরিবর্তমান নিদর্শন ডিস্কে ধরা থাকায় সমাজপ্রেক্ষিতে সংগীতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভব হল।
(৬) ব্যবসার খাতিরে গ্রামোফোন কোম্পানীগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রোতার জন্য বিভিন্নরকম গান বাজারে ছাড়ত। ভক্তিগীতি থেকে চটুল প্রেমের গান কিছুই বাদ যেতনা। ক্রমে বাংলা গান ছাড়াও হিন্দি মার্গসংগীত এবং কাওয়ালী, গজল, কাজরী, গরবা, নাত,গীত প্রভৃতি সর্বভারতীয় মিশ্র, লঘু ও লোকসংগীত সবই রেকর্ড হতে লাগল। এর ফলে সংগীতের সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটটি সাধারণ বাঙালী গীতরসিকের কাছে হল অবারিত। পরবর্তী বাংলা গানে এর সুদূরপ্রসারী ফল ফলল ।
(৭) মার্গসংগীতের ক্ষেত্রে আগের যুগে ঘরানার যে বিশুদ্ধতা ছিল এখন রেকর্ডের ব্যাপক প্রসারের ফলে সেই সব ঘরানার বন্ধ দরজা সবার জন্যে খুলে গেল ।
(৮) এক কথায় সংগীতে অ্যারিস্টোক্রেসির দিন শেষ হল। শুরু হল গণতন্ত্র ।

নজরুলগীতি –

বাংলা সাহিত্য ও গানের জগতে নজরুলের সৃজনশীলতার আয়ুষ্কাল মাত্র বাইশ বছর, ১৯২০ থেকে ১৯৪২। এর মধ্যে প্রথম দশকটিতে কাব্য রচনার এবং পরবর্তীকালে গান রচনারই প্রাধান্য। ভাবতে অবাক লাগে যে এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে তিনি কি করে সাড়ে তিন হাজার গান (সুর সহ) রচনা করলেন। তাঁর এই সৃষ্টি প্রাচুর্যের পিছনে গ্রামোফোন কোম্পানীর অবদান অনেকখানি। ইতিপূর্বে উনবিংশ শতাব্দীতে যে সব গীতিকার সুরকারেরা এসেছিলেন তাদের প্রত্যেকেরই প্রথম জীবনে সংগীতশিক্ষার একটা ইতিহাস ছিল।

নজলের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত পরিবারবিচ্যুত ছন্নছাড়া বাল্যজীবনে সংগীত শিক্ষার সেরকম কোনো ইতিহাস আমরা পাইনা। কিন্তু তখনই লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে গানের প্রাথমিক ব্যাকরণটুকুও যে তিনি খুব ভালোভাবেই রপ্ত করেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর গানই এর অনুকূলে সবচেয়ে বড় সাক্ষী। আসলে যারা অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী তাঁদের কাছে 'ইশারাটুকু'ই হয়ত যথেষ্ট। তাই যেভাবেইহোক নজরুল সুরের তালিম পেয়েছিলেন। শুধু মার্গসংগীত নয় উত্তর ভারতের গজল প্রভৃতি লঘুসংগীত, কাজরী, গরবা, নাতগীত প্রভৃতি সুর, নানা বিদেশী সুর এবং প্রচলিতলোকসংগীত সবই তাঁর জানা হয়েছিল এবং অন্যের গান এবং নিজের লেখা ও সুর দেওয়া গান দুটোই তিনিই মনের খুশিতে গাইতেন। বিশের দশকের গোড়াতে নবীন কবি কাজি নজরুল ইসলামের গানের একটা সমঝদার গোষ্ঠী তৈরি হয়ে উঠেছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে তিনি যখন বিভোর হয়ে গান গাইতেন তখন সেই গানের অবারিত প্রাণ প্রাচুর্যের আকর্ষণ কত দুর্বার ছিল। সংগীতপটুতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের সম্মোহন। ধনীর প্রাসাদ থেকে ছেলেছোকরাদের আড্ডায় সর্বত্র ছিল তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনা। ঝানু ব্যবসাদার গ্রামোফোন ও সিনেমা কোম্পানী গুলি বুঝেছিল এই ক্ষমতাকে কাজে লাগালে সোনা ফলবে এবং নজরুলকে তারা কাজে লাগাতে দেরি করে নি। গ্রামোফোন কোম্পানীর চাহিদা মত নজল অবিরত অজস্র গান লিখেছেন। সাধারণতঃ এই ধরণের যান্ত্রিক উৎপাদনে শিল্পের গুণ নষ্ট হয় এবং শিল্পীর প্রতিভা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু আচর্যের বিষয় নজরুলের ক্ষেত্রে তা হয় নি। এ কথা সত্য যে তাঁর সব গান সমান উচচাঙ্গের নয়। বা বেশ কিছু সংখ্যক ফরমায়েশি যান্ত্রিক গানও তাঁর আছে, তবু এ কথা সত্য যে গ্রামোফোন কোম্পানীর কাজটা তাঁর মনের মত ছিল। তাঁর জীবিকা ও আনন্দের সমন্বয় হয়েছিল এখানে। তাই ঝড়তি পড়তি যান্ত্রিক উৎপাদন বাদ দিয়েও যা কালের মানদণ্ডে সসম্মানে উত্তীর্ণ হবার যোগ্য তার পরিমাণও কম নয়। ভাবের দিক থেকে নজল গীতির দুটি মূল ধারা - দেশাত্মবোধক গান এবং রোমান্টিক কোমল ভাবের গান। এর মাঝখান দিয়ে হাসির গানের একটি অতি ক্ষীণ স্রোতধারা আছে। দেশাত্মবোধক গানগুলি বেশীর ভাগই কোরাস বা সম্মেলক গান এবং তাদের সুর বিদেশী ঘেঁষা, অনেক সময়ে তা মার্চিং সংও বটে। এই গানগুলি বাংলা গানের জগতে প্রায় তুলনারহিত। তবে এদের সংখ্যা কম। প্রকৃত অর্থে নজলগীতি বলতে আমরা তাঁর কোমল ভাবের রোমান্টিক গানগুলিকেই বুঝি। এদের ভাষা আপাতদৃষ্টিতে রাবীন্দ্রিক, কিন্তু সে শুধু বহিরঙ্গে। প্রেম ও প্রকৃতি অনুষঙ্গে বাংলা গানে তখনকার দিনে যে সব রাবীন্দ্রিক চিত্রকল্প ব্যবহার করা হত তিনি সেগুলিই ব্যবহার করেছেন। তাঁর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন উচ্ছ্বাসময় ভাবালুতা ও ফেনিল হৃদয়বেগ। কিন্তু এছাড়া কোনো গূঢ় গভীর অর্থব্যঞ্জনা তাঁর গানের কথায় নেই। রবীন্দ্রনাথ তো দূরস্থান এমন কি অতুল প্রসাদ বা রজনীকান্তের গানের কথাও যতখানি তাঁদের জীবনার্থসন্ধানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে নজরুলের তা নয়। তাঁর যে বালিকাটি কাবেরী নদী জলে আনমনে একই সঙ্গে চম্পা ও শেফালি ফুল ভাসায়, কিংবা মেঘলা নিশিভোরে মেঘবরণ কেশ যে কিশোরীর জন্য কবির মন কেমন করে তারা শুধু ক্ষণিক স্বপ্নমায়া মাত্র। একবারের জন্য ফুটে উঠে মিলিয়ে যাওয়া চিত্র ব্যতীত আর কিছু তারা নয়। বস্তুতঃ কথার খুব বেশি গুরুত্ব নজরুল গানে নেই। চেনা জানা মোহমদির চটুল চপল দ্রুত বিলীয়মান স্বপ্নচিত্রাবলীর কাঠামোয় পুঞ্জ পুঞ্জ যে সুর ঘনিয়ে উঠেছে সেইখানেই এ গানের আসল আবেদন এবং এই সুরের বৈচিত্র্য অশেষ। সুরের মূল কাঠামোর ওপর সূক্ষ্ম কারুকার্যও বিশেষ মনোহর। যে সব ধরণের গান তিনি বেঁধেছেন সেগুলি মোটামুটি এইরকম -

(১) হিন্দুস্থানী রাগভিত্তিক গান, যেমন - শূন্য এ বুকেপাখি মোর (ছায়ানট), এ কি তন্দ্রা বিজড়িত আখিঁপাত (মালকোষ), আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায় (দরবারি কানাড়া), অঞ্জলি লহ মোর (তিলং)ইত্যাদি।

(২) দক্ষিণ ভারতীয় রাগভিত্তিক - কাবেরী নদী জলে কে গো বালিকা (কর্ণাটি সামন্ত), নীলাম্বরী শাড়ি পরি নীল যমুনায় কে যায় কে যায় (নীলাম্বরী)ইত্যাদি।

(৩) নিজস্ব রাগভিত্তিক- হাসে আকাশে শুকতারা হাসে (অণরঞ্জনী), শোন ও সন্ধ্যামালতীবালিকা তপতি (সন্ধ্যামালতী) ইত্যাদি।

(৪) গজল - বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল, আমায় চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কেগো দরদি ইত্যাদি।

(৫) কাজরি - সখি বাঁধ লো বাঁধ ঝুলনিয়া, উচাটন মন ঘরে রয় না ইত্যাদি।

(৬) বিদেশী সুরের গান - দূর দ্বীপবাসিনী চিনি তোমারে চিনি (হাওয়াইয়ান) ম ঝুম ঝুম ঝুম খেজুর পাতার নূপুর বাজায়ে কে যায় (আরবি সুর), শুকনো পাতার নূপুর পায়ে (ইরানি ও তুর্কি), মোমের পুতুল মমির দেশের মেয়ে (মিশরীয়) ইত্যাদি।

কাব্যসংগীতে কথার চেয়ে সুরের গুত্ব যাঁরা বেশী ভালোবাসেন নজলগীতি তাঁদের খুবই প্রিয়। এ গান ভালোভাবে গাইতে গেলে সুরজ্ঞান ও কণ্ঠ সাধনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তদতিরিক্ত কোনো গভীর অনুভূতির প্রয়োজন নেই। এইখানে সমশ্রেণীর অন্য গানের চেয়ে নজলগীতির জিত। তা অতি উৎকৃষ্ট সুরসমবায়ে রচিত বলে শ্রোতার সুরের পিপাসা মেটায় অথচ তা উপভোগ করবার জন্য মনকে কোনো গভীর তন্ময়তার স্তরে যেটা গড়পড়তা জীবনের কোলাহলে বাইরে সেখানে নিয়ে যেতে হয়না। এই জন্য নজলগীতি এত জনপ্রিয়। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্তের গানের কথা ও সুর পরস্পর সাপেক্ষ। নজলগীতিতে তা নয়।

দিলীপ কুমার রায় –

বাংলা সংগীত ও সংস্কৃতির জগতে দিলীপ কুমার রায় একজন মহৎ অথচ অবহেলিত প্রতিভার উদাহরণ হয়ে রয়ে গেলেন। সংগীত তাঁর বহুবিচিত্র ব্যক্তিত্বের একটা দিকছিল। তিনি গায়ক হিসাবে যত বড় ছিলেন তার চেয়েও বড় ছিলেন সুরস্রষ্টা (কম্পোজার) হিসাবে। স্বদেশ ও বিদেশের নানারকম সুর নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এ বিষয়ে তিনি পিতা দ্বিজেন্দ্রলালের ধারাতেই যাত্রা শুরু করেছিলেন বলা যায়। তবে সুর সাধক হিসাবে তিনি তাঁর পিতাকে অতিক্রম করে আরও অনেকদূর গিয়েছিলেন একথা সত্য।

মার্গসংগীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি, নজল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত প্রভৃতি গান যেমন তিনি কিছুটা নিজস্ব প্রণালিতে গাইতেন সেইরকম তাঁর স্বরচিত ও সুরারোপিত বহু গানও আছে। গানে তিনি সুরবিহার ও সুরবিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। তার নানা বিচিত্র স্বাদের গানের কিছুটা নমুনা দেওয়া হল ঃ-

সখি মোর প্রাণধন, সেই বৃন্দাবন লীলা অভিরাম সবি (কীর্তনাঙ্গ), রাঙাজবা কে দিল তোর পায় মুঠো মুঠো (প্রচলিত), বুলবুল মন সুরে ভেসে (লোকগীতি), চাঁদের হাসি বাজল আকাশ ছেয়ে (ফরাসী সুর), অকুলে সদাই চল ভাই ছুটে যাই (ইংরাজি), ঘুমযাই মা (জার্মান) , তোমারি পানে অকূল টানে (ইতালিয়), মধুর স্বরে শয়নে স্বপনে (জিপসি সুর)। এছাড়া রাগভিত্তিক গানের এবং নিশিকান্ত প্রমুখ কবিদের কবিতা সুরারোপে গান তৈরি করার উদাহরণ অসংখ্য । যৌবনের মধ্য গগনে দিলীপকুমার সংসারজীবন ছেড়ে পণ্ডিচেরি চলে গেলেন এবং ধর্মজীবন আশ্রয় করে বাকি জীবন কাটালেন। তাঁর সংগীতের কোনো উত্তরসাধক আর রইল না। এখন ও কোনো কোনো সংগীত বিশেষজ্ঞ হয়ত দিলীপকুমারের দুএকটি গান গাইতে পারেন কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় অত্যন্ত কম এবং সাধারণ্যে অজ্ঞাত ।

আধুনিক গান –

এতকাল গান ছিল ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত। ক্রমে এল সমবায়িক গান। অর্থাৎ গীতিকার সুরকার ও গায়কের মিলিত প্রচেষ্টার গান। মোটামুটি বিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে এই রকম গানের প্রসার হতে শুরু করে এবং জনপ্রিয়তা ও উৎকর্ষের শীর্ষচূড়ায় অবস্থান করে পঞ্চাশ ষাটসত্তরের দশকে। এই শ্রেনীকে আধুনিক গান নাম দেওয়া হয়েছে। যদিও আধুনিক শব্দটি সর্বদাই আপেক্ষিক ।

পাঁচজন মিলে যে গান হয় সে ধারণাটি এসেছিল থিয়েটার থেকে। নাটকের প্রয়োজনে ব্যবস্থাপক যে গানটি দিলেন অনেক সময়েই তাতে সুর দিতেন অন্য লোক। গাইতেন আর একজন। ক্রমে রেকর্ডিং এর জগতে এই রীতি চালু হল এবং গীতিকার সুরকার আলাদা হয়ে গেলেন । শুধু গ্রামোফোন নয় চলচ্চিত্রের ভূমিকাও এখানে অনেকখানি। মধ্য বিংশ শতকের বাংলায় চলচ্চিত্রের বহু গানই অত্যন্ত জনপ্রিয় আধুনিক গান হিসাবে স্বীকৃতিপেয়েছে । আধুনিক গানের গীতিকাররা কেউ বড় মাপের কবি ছিলেন না যেমন অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায়, মমতা মিত্র, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শৈলেন রায়, সুবোধ পুরকায়স্থ , শ্যামল গুপ্ত , গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। সুরকারেরা হলেন হিমাংশু দত্ত , কমল দাশগুপ্ত, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরি (এঁর নিজের লেখা গানও আছে), বাণীকুমার, নচিকেতা ঘোষ এবং আরও অনেকে । বিখ্যাত গায়কদের মধ্যে পঙ্কজ মল্লিক, শচীনদেব বর্মন, অখিল বন্ধু ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, জগন্ময় মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, যুথিকা রায়, গীতা দত্ত, সুপ্রভা সরকার, সুপ্রীতিঘোষ, ইলা বসু ,উৎপলা সেন, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, প্রভৃতি অগণিত শিল্পী। আরও বহু শিল্পীই অনুল্লিখিত রয়ে গেলেন ।

আধুনিক গানের ভাষা সম্পূর্ণ ভাবে রবীন্দ্র নজল অনুসারী। অবশ্য রাবীন্দ্রিক শুধুই বহিরঙ্গে। আধুনিক কবিতার ভাষায় গত শতাব্দী জুড়ে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়ে গেছে আধুনিক গানের ভাষায় তার কণামাত্র ছায়াপাত হয়নি। সুরের সঙ্গে কথার সম্পর্ক এখানে আপতিক, অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে সংগতি আছে কিন্তু গভীর কোন বন্ধন নেই । তাই ভাষান্তরিত হলে এ গানের সৌন্দর্য কিছুমাত্র নষ্ট হয় না এটা বহুবার দেখা গেছে। আধুনিক গানের প্রথম যুগে যখন গীতিকার সুরকার গায়ক একসঙ্গে বসে সংগীত নির্মাণ করতেন তখন ব্যাপারটা অনেকখানি টিমওয়ার্কের মত ছিল এবং তার ফল ভালোই হত। অজয় ভট্টাচার্য - হিমাংশু দত্ত - শচীন দেববর্মণের টিমওয়ার্কে তৈরি 'আলোছায়া দোলা উতলা ফাগুনে' বা 'তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে' অনবদ্য সৃষ্টি। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাক মিউজিক এসে যাওয়ায় এখন আর টিম ওয়ার্কের দরকার হয়না। ব্যবসায়িক কারণেও গীতিকার সুরকারের সমঝোতা হবার অবকাশ কম। সেইজন্য আধুনিক গানের কথা ও সুর সর্বদা একপথে চলে এমন বলা যাবেনা ।

আধুনিক গানের যেটা প্রশংসনীয় দিক সেটা তার সুর। তার মধ্যে অনেক রকম বৈচিত্র্য আছে। বিশুদ্ধ রাগাশ্রয়ী (বাঁধো ঝুলনা তমাল বনে - গায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়) বিশুদ্ধ লোকসংগীত (ও দয়াল বিচার করো - গায়ক শচীন দেব বর্মণ, পরে ইন্দ্রনীল সেন), পাশ্চাত্য সুর (উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা) প্রভৃতি যেমন আছে তেমনই সিংহভাগ জুড়ে আছে মিশ্র সুর । 'শান্ত নদীটি পটেআঁকা ছবিটি'র মত সমতল গানও আছে, আবার স্বরবিন্যাসে উচচবচ 'ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস' এর মতগানও আছে।

আধুনিক হিন্দি গান ও বাংলা গান –

আধুনিক বাংলা গানের সঙ্গে আধুনিক হিন্দি গানের সম্পর্কটা অতি নিবিড়। এই সম্পর্কসৃষ্টির পেছনে চলচ্চিত্রের খানিকটা অবদান আছে । ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের প্রথম যুগে যেমন বহু বাঙালী পরিচালক মুম্বাই গিয়ে সেখানকার হিন্দি চলচ্চিত্রের উদ্যোক্তা হয়েছিলেন সেইরকম অল্পকালের মধ্যে বাঙালী গায়ক সুরকার মুম্বই-এর গানের জগতে প্রতিষ্ঠা পেলেন ।

শচীনদেব বর্মণ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গায়ক, সংগীতপরিচালকরা একই সঙ্গে হিন্দি ও বাংলার দুই সংগীত জগতেই ঘোরাফেরা করেছেন। তাঁদের কিছু বাংলা গানের হিন্দি রূপভেদে হিন্দি চলচ্চিত্রেও দেখা যায়। স্বভাবতঃই হিন্দি ও বাংলা দুই ভাষার আধুনিক গান এতে খুব কাছাকাছি চলে এল এবং পরস্পর প্রভাবিত করতে লাগল । স্বাধীনতার পরে হিন্দি চলচ্চিত্রের বিপুল উৎপাদন ও ভারতব্যাপী প্রচারের ফলে হিন্দি সিনেমার গান সর্বত্র ছেয়ে যায়। রেকর্ডরেডিও চলচ্চিত্র এবং সর্বশেষে সত্তরের দশকে দূরদর্শন হিন্দি গানের জগৎ টিকে সর্বভারতীয় শ্রোতার কাছে সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরে। গায়কেরা স্বভাবতঃই্ সর্বভারতীয় পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠার আশা নিয়ে কাজ

করেন। বাংলা আধুনিক গানের জগতেও তাই যেমন অন্য প্রদেশের শিল্পীরা এসেছেন, বহু বাঙালী শিল্পীও আজ মূলতঃ হিন্দি গানের গায়ক গায়িকা। বাংলা আধুনিক গান নামধেয় ধারাটির মূলস্রোত যে আজ হিন্দি ভাষার খাতে বইছে একথা বললে বোধহয় দোষ হয় না ।

রিমেক গান –

রিমেক একটি শ্রেণীসূচক শব্দ। পঞ্চাশ ষাট এমনকি সত্তরের দশকের দিকে যে সব বাংলা আধুনিক গান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল নতুন কালের শিল্পীদের দিয়ে সেগুলি নতুন করে গাইয়ে বাজারে ছাড়া হচ্ছে এবং এদেরই নাম দেওয়া হয়েছে রিমেক গান। এই রিমেক নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানারকম প্রতিক্রিয়া আছে। অনেকেরই ধারণা এটা বাংলা গানের দৈন্যদশার উদাহরণ এবং এতে পুরানো শিল্পীদের প্রতি অবিচার করা হল । এ বিষয়ে সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা যেতে পারে ।

(১) গানের জগতে কপিরাইটের কি নিয়মকানুন আছে ঠিক জানি না কিন্তু সেটা রক্ষা করে পুরনো গানের পুনঃপ্রকাশ হলে তা দোষের হবে কেন । বরং সেটা তো ঐ গানগুলির পক্ষে খুব বড় সার্টিফিকেট। বিপণনের নিয়মে যুগের চাহিদায় এককালে অজস্র আধুনিক গানে দেশ ভরে গিয়েছিল, যোগ্যতমের উদ্বর্তনের নীতিতে পরের প্রজন্মে এসেও যেগুলি উজ্জ্বল ও আবেদনবাহী হয়ে বেঁচে আছে তারা নবীন যুগের গায়ক গায়িকার গলায় আশ্রয় পেয়ে ভাবীকালে পাড়ি দেবে এটাই তো স্বাভাবিক।

(২) গানের জগতে 'রিমেকটা'ই নিয়ম। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ প্রমুখের গানের আদি রেকর্ডগুলি লুপ্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্বকণ্ঠে 'তবু মনে রেখো' গেয়েছিলেন । তাই বলে সুচিত্রা মিত্রের ঐ গান রেকর্ড করবার কোনো বাধা হয়নি। একই গান সাহানা দেবী, সুচিত্রা মিত্র , গীতা ঘটক, লোপামুদ্রা মিত্র গেয়েছেন। রিমেকের কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। আঙুরবালা, ইন্দুবালাদের গাওয়া গান প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছেন কোনো আপত্তি ওঠে নি। দিলীপ রায়ের গাওয়া দ্বিজেন্দ্রগীতি সমকালেই মঞ্জু গুপ্তা গেয়েছেন।
তাতে ক্ষতি হয়নি। প্রকৃতপক্ষে যে গান একবার রেকর্ডবদ্ধ হয়েই নির্বাণ লাভ করে সে তো মৃত গান।
যে গান সজীব তা লোকের গলায় বার বার নতুন করে বাজবে এবং তাতেই তার সার্থকতা ।

(৩) তথাকথিত রিমেক গানের পুরানো কথা ও সুর অক্ষুণ্ণ আছে। বদলেছে শুধু গায়ক এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণ যন্ত্রানুসঙ্গ। একে রিমেক বা নবনির্মাণ বলা যায় না। যদি কথা ও সুরে যথেচ্ছ পরিবর্তন হত তাহলে হয়ত অধিকার ভঙ্গের প্রশ্ন উঠত। অথবা সেরকম স্বেচ্ছাচারী প্রয়াসকে শ্রোতারাই প্রত্যাখান করতেন।

(৪) আপাতত 'রিমেক'কে তাই কালজয়ী বাংলা গানের অবমাননা বলব না, বলব সংবর্ধনা।

গণসংগীত –

সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ প্রচারধর্মী একপ্রকার সম্মেলক গানের নাম গণসংগীত। মোটামুটিদ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালে চল্লিশের দশকে এর উৎপত্তি হলেও এর মূল পাওয়া যাবে বাংলা স্বদেশি গানে। বিশেষতঃ নজরুলের সংগীত যেখানে শ্রমিক কৃষকের অগ্রগতির অনুপ্রেরণা আছে তাকে গণসংগীতেরপূর্বাভাস বলা যেতে পারে । জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরি প্রভৃতি প্রতিভাবান গীতিকার সুরকারেরা একদিন এই গানের আসরে সমবেত হয়েছিলেন এবং তাঁদের জন্যই এ শাখা গানের ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য বিবেচিত হয়েছে। এঁরা নিজেদের লেখা গান ছাড়াও সুকান্ত ভট্টাচার্য, দিনেশ দাশ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিদের শ্রেণী সংগ্রামের কবিতায় সুরারোপ করেও গান করতেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় আধুনিক বাংলা গানের মধ্যেও পুরোপুরি গণসংগীত নয় অথচ আবেদন ও সুরে ঐ ধাঁচের কিছু গান ছিল। যেমন সলিল চৌধুরীর সুরে ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গলায় কোনো এক গাঁয়ের বধূ, রাণার, অবাক পৃথিবী, শোনো বন্ধু শোনো প্ভৃতি গানগুলির কথা সকলের মনে আছে ।
প্রকৃত গণসংগীতের সুর অত্যন্ত সাদামাঠা, সাধারণতঃ লোকসংগীতের সুরে বাঁধা। এর লয় দ্রুত এবং স্বরক্ষেপণ প্রণালী কাটা কাটা। এর কথায় ও সুরে লোকসংগীতের সঙ্গে একটা আপাত সাদৃশ্য আছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটির উৎপত্তি লোকজীবনে নয়।
গণসংগীত স্বদেশী গানের মতই শহরবাসী শিক্ষিত ও সমাজচেতন মানুষের সৃষ্টি এবং তাদের দ্বারাই পরিবেশিত গান।

জীবনমুখী গান –

জীবনমুখী গান নামটি একটি শ্রেণীগত ও বাণিজ্যিক অভিধা। বিংশ শতকের একেবারে শেষ দশকে এই গান সহসা সোচ্ছ্বাসে আমাদের চেতনার ওপর একেবারে আছড়ে পড়েছিল বটে তবে এর বীজ কোনো কোনো আধুনিক বাংলা গান ও গণসংগীতে ছিলনা এমন নয় ।
রবীন্দ্র-নজরুলের ধারায় এ গানও ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত। অর্থাৎ যিনি গীতিকার তিনিই সুরকার ও গায়ক। অনেক সময় বাদকও।
বাংলায় এ গান আনলেন সুমন চট্টোপাধ্যায়। তিনি প্রথমে প্রথাগত সংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত শিখেছিলেন। তারপর প্রথম যৌবনে কর্মসূত্রে তিনি বেশ কয়েক বছর ইউরোপ থাকেন এবং সেখানকার সমসাময়িক সংগীতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। দেশে ফিরে প্রথম ক্যাসেট বাজারে ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাম ও গানের প্রভাব দাবানলের মত তরুণ সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

সুমনের সংগীত বিষয়ক কিছু বিছিন্ন রচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । সেখানে তিনি খুব প্রাঞ্জলভাবে নিজের সাঙ্গীতিক বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।

(১) বিংশ শতাব্দিতে বাঙালীর সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনে সর্বত্র অভাবিতপরিবর্তনে সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেছে। কিন্তু গানের ভাষায় আমরা এখনও পুরানো যুগে পড়ে আছি। সেই 'মোরা' 'চাহি' 'নাহি' 'জীবনতরী' 'প্রিয়ার আঁচল' এবং 'মাধবী রাত' -এরই প্রাধান্য দেখতে পাই।

(২) শতকরা নিরানববই ভাগ গানই প্রেমের এবং সে প্রেমও ভাবালুতায় আবিল ।

(৩) আধুনিক বাংলা গানের সুরের ক্ষেত্রে অনেক ভালো কাজ আছে। কিন্তু সেই সুর তার উপযুক্ত কথার শরীর না পাওয়ায় তার আবেদন গেছে হারিয়ে।

একটু দীর্ঘ হলেও সুমনের জোরালো বক্তব্য উদ্ধৃত না করে পারা গেল না ----- '' জীবনের প্রতিটি প্রসঙ্গ আসুক। আসুক নতুনভাবে, দরকার হলে একেবারে প্রথাবিরোধী সৃষ্টিছাড়া আঙ্গিকে। লোকায়ত ভাবনা, লোকায়ত সুরও থাক অচেনা সুরও আসুক। ভাঙা গড়া হোক এবং হোক তা আমাদের রোজকার মুখের ভাষায় যথাসম্ভব। ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হোক বহুব্যবহৃত চিত্রকল্প রূপকল্প বাক্য । কথা বলার ভঙ্গি আসুক। যে কথা আমরা নিজেদের মনে বলি, বন্ধুদের কাছে টেবিল চাপড়ে বলি, বাবা মাকে বলি , সন্তানকে বলি , প্রেমিকাকে বলি বা যে কথাগুলো আজো বলে উঠতে পারিনি, যে কথা বিশ্বসংসারকে জানিয়ে দিতে চাই, মিছিলে সামিল হয়ে বলতে চাই, স্বপ্নের ভাষায় বলতে চাই.... যে অব্যক্ত কথা আমরা দেখে নিই, পড়ে নিই অন্যের চোখে, হাতের ইসারায়, রঙে, গন্ধে, দুর্গন্ধে---- সব কথা দিয়ে গান হতে পারে । হওয়া দরকার।''(সংগীতচর্চা ১৯৯০, পুনর্মুদ্রণ ধ্রুবপদ, বার্ষিক সংকলন ১৯৯৯)

সুমন এটা করতে পেরেছিলেন। অন্ততঃ প্রথম দুটি ক্যাসেট ছিল অনবদ্য । সুরে তিনি সচেতন ভাবেই আধুনিক পশ্চিমি কিছু বিখ্যাত গানকে অনুসরণ করেছিলেন বটে তবে অন্য রকম নিজস্ব সংযোজনাও ছিল ।

দেখতে দেখতে তাঁর প্রদর্শিত পথেবেশ কয়েকজন গীতিকার সুরকার গায়ক এসে গেলেন - যেমন নচিকেতা, শিলাজিত, অঞ্জন দত্ত প্রভৃতি। তারপর এসব ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তার ফলে শিল্পকে যে মূল্য দিতে হয় তাই হল (অর্থাৎ খাঁটি জিনিসের চেয়ে তার জল মেশানো হালকা সংস্করণটাই বাজার দখল করে নিল)। প্রথম আবির্ভাবে সুমন যে উঁচুসুরে তার বেঁধেছিলেন, নিজের পরবর্তী সৃষ্টিগুলিতে তিনি সেই মান ধরে রাখতে পারেননি। আর অন্যেরা কোনোদিনই সুমনের পর্যায়ভুক্ত ছিলেন না। তাঁদের এক আধটা গান কথায়-সুরে বিদ্যুৎদীপ্তির মত ঝলসে উঠেছে বটে তবে তার সংখ্যা খুব বেশী নয়। অল্পদিনের মধ্যে এটাও দেখা গেল যে জীবনমুখী গানের এই সব উঠতি ও তরুণ মহলে সমাদৃত শিল্পীরা কেউ কেউ প্রকাশ্য গানের আসরে উদ্ভট সাজসজ্জা ও হাবভাব দিয়ে একরকম নাটক সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। হয়ত নিজেদের অন্তঃসারশূন্যতা ঢাকবার জন্যই। কিন্তু গান গানই, তা অভিনয় নয় এবং গায়কের ব্যক্তিগত ইমেজের ওপর তার স্থায়িত্ব খুব একটা নির্ভর করে না। দশ বছর কাটতে না কাটতেই দেখা যাচ্ছে এঁদের সম্মোহন অনেকখানি কমে গেছে। তবে একথা সত্য যে বাংলা আধুনিক গানের সাম্প্রতিক বদ্ধজলায় তাঁরা একটা নতুন উচ্ছ্বাস তৈরি করে গেলেন, মুক্তির একটা পথ দেখালেন এবং তাঁদের সত্যিকারের ভালো রচনাগুলি বাংলা গানের ভান্ডারে স্থায়ী সম্পদ হয়ে অপেক্ষা করে রইল ভবিষ্যতে বার বার গীত হবে বলে।

বাংলা ব্যান্ড –

জীবনমুখী গানের ধারাতেই এসেছে বাংলা ব্যান্ড । নগর জীবনের চলতি ভাষায় সমসাময়িক জীবনের বহু সমস্যার কথা এখানে তির্যকভঙ্গীতে বলা হচ্ছে। তফাত এই যে সুমন, নচিকেতা, শিলাজিৎ যা একা একা করেছেন এঁরা সেটাই দল বেধে করছেন। বিলিতি রক গানের যে সব ব্যান্ড, এদের গঠন অবিকল সেই ধাঁচের। ভূমি, চন্দ্রবিন্দু, ক্যাকটাস, পরশপাথর প্রভৃতি ব্যান্ড গুলি বেশ নাম করেছে এবং তরুনপ্রজন্মের কাছে এঁদের আদরও আছে । তবে সত্যের খাতিরে বলতেই হয় কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার মত কোনও লক্ষণ এখনও এঁরা দেখান নি। সুমনের ক্ষুরধার লেখনী এঁরা কেউই পাননি । তাই গানের কথা দুর্বল । গায়ক-গায়িকাদের কণ্ঠ ততোধিক দুর্বল। যন্ত্রের উচ্চধবনিতে তাও অর্ধেক ডুবে যায়। সব মিলিয়ে এঁরা যতখানি কোলাহলের সৃষ্টি করেন ততখানি গান সৃষ্টি করে উঠতে এখনও পারেননি।

লোকগীতি –

নিরক্ষর গ্রামীণ মানুষের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিপ্রসূত যে গান তাকেই সাধারণতঃ লোকসংগীত বলা হয়। বাংলার (বাংলাভাষী অঞ্চলের) অঞ্চলভেদে এই লোকগীতির রূপ আলাদা। বিভিন্ন গোষ্ঠি ও সম্প্রদায় ভেদেও এর আলাদা আলাদা রূপ। সব মিলিয়ে এর পরিমাণ ও বৈচিত্র্য দুটোই সুবিশাল। অভিজাত সংগীতের তলায় তলায় লোকগীতির একটি অন্তঃসলিলা ধারা চিরকালই বাংলায় প্রবাহিত ছিল। স্ত্রী সমাজের নানা ব্রতে, বিবাহে, অন্ত্যজ কৌম সমাজের পালে পার্বণে নিজেদের গান ছিল । চাষি মাঝিদের কাজের গান ছিল। আর ছিল লোকায়ত নানা ধর্মসম্প্রদায়ের নিজস্ব সাধনার গান। এইসব গানের সুর তালে খুব বেশি জটিলতা থাকার কথা নয়। তা ছিলও না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য ছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীর গানের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিতহয়ে এসেছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। এরকম হবার কারণ হলো প্রাগাধুনিক যুগে মানব সমাজের বিছিন্নতা। বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের অভাব শুধু নয় , বহির্জগতের সম্বন্ধেজ্ঞানের অভাব এবং

ভীতি তাদের নিজ নিজ সীমার মধ্যে বেঁধে রাখত এবং ঐ সীমার মধ্যেই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিটুকু বিকশিত হয়ে উঠত। কালে-ভদ্রে বাইরের জগত থেকে উড়ো হাওয়ার মত কোনও খবর এসে পৌঁছালে তার যৎসামান্য অনুরণন তাদের মনে জাগত, গানেও তা ফুটত, কিন্তু তার চরিত্র বদলে যেত না। মোটামুটি এই ভাবেই কেটেছিল উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত । বিংশশতক থেকে আধুনিকপ্রযুক্তি ও শিক্ষা সভ্যতার ঢেউ গ্রামাঞ্চলে একটুএকটু লাগতে আরম্ভ করে । শহরবাসী-বিদগ্ধজন লোকসংগীতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হন। বাংলা গ্রাম্য গাথা ও গীতির সঙ্গে সঙ্গে পল্লীসংগীতও উদ্ধার করবার প্রবণতা দেখা দেয়। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য স্বদেশি গান লিখলেন এবং তাতে পল্লীসংগীতের সুর ব্যবহার করলেন। অল্পদিন পরে গ্রামোফোন কোম্পানীগুলি যখন নানা রসের গান বাজারে ছাড়তে আরম্ভ করেছে তারাও পল্লীগীতির কিছু রেকর্ড করিয়েছিল। আরও পরে গণসংগীত শিল্পীরা পল্লীগীতির আদর্শ নিয়েছিলেন এবং হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মত সংগীতপ্রেমী ব্যক্তিরা আপন মনের তাগিদেই পল্লীগীতি বিষয়ে সম্যক অনুসন্ধান করেন । স্বাধীনতার পরে বাংলার গ্রাম্যজীবনের চেহারায় সম্পূর্ণ ওলোটপালোট ঘটেগেছে । বাংলাভাষী ভূখন্ডদুটি বিবদমান শত্রুরাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ হয়ে গেল ।

স্বল্প পরিসর ও পূর্বাবধি জনবহুল পশ্চিমবঙ্গে অত্যধিক লোকস্ফীতি হেতু অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সামাজিক অবক্ষয় শ্বাসবোধকারী অবস্থায় গিয়ে পৌঁছল । অদ্ভু ত প্রাণশক্তি বাঙালি জাতির যে এর মধ্যেও সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি সংগীতের চর্চা হয়েছে এবং উন্নতি হয়েছে। লোকায়ত জীবন ও লোকসংগীত সম্বন্ধে ইদানিং সত্যিকারের ভালো গবেষণা হয়েছে এবং বহু লুপ্তরত্ন উদ্ধার হয়েছে।

শিক্ষিত সমাজে লোকসংগীতের আদর হওয়ায়বহু লোকসংগীতশিল্পী দেশে বিদেশে পরিচিত ও পুরষ্কৃত হয়েছেন । কিন্তু নিষ্ঠুর সত্য এই যে নতুন করে লোকসংগীত আর বোধ হয় কোনোদিনই রচিত হবে না। গ্রামীণ জীবনের যে বিন্যাস থেকে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে লোকগীতি গুলি একদিন উঠে আসত সে বিন্যাস একেবারেই ভেঙে গেছে। বিশেষতঃ আজকে দূর-দূরান্ত গ্রামাঞ্চলে ভিডিও হল আছে । যেখানে বিদ্যুৎ নেই সেখানেও সম্পন্ন ঘরে টেলিভিশন আছে। বেনো জলের মত মিডিয়াবাহিত বিশ্বসংস্কৃতি নিজস্ব শিল্পবোধকে একেবারেই ভাসিয়ে দিয়েছে। বিশুদ্ধ লোকসংগীত তাই আজ সংরক্ষণযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য একটি বিষয়, কিন্তু তার ধারাটি আজ শুষ্কপ্রায় । ক্ষীণস্রোতে তা মাত্র বেঁচে আছে বিভিন্ন লোকায়ত সাধকদের নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে। বাংলার লোকগীতির মূলধারাগুলি মোটামুটি এইরকম --

(১) ভাটিয়ালি - মূলতঃ একটিআঞ্চলিক সুর কাঠামো, যার উদ্ভব হয়েছে নদী খাল বিলে ভর্তি পূর্ববঙ্গের ভাটি অঞ্চল থেকে।

(২) জারি গান -- কাহিনী ভিত্তিক গান - মহরমের পালা অবলম্বনে তৈরি । সুরের গঠনে কখনো বা টানা করুণ সুর, কখনো বা যুদ্ধের উন্মাদনা আছে ।

(৩) সারিগান -- এটি একপ্রকার কর্মসংগীত। প্রধানত নৌকা বাওয়ার এবং গৌণতঃ চাষ বা অন্য কোনও কাজের গান।

(৪) বাউলগান -- লোকসংগীতসমূহের মধ্যে সর্বাধিকপ্রচলিত এবং বহু শাখায় বিভক্ত ।

(৫) অন্যান্য মরমী গান -- নানা প্কার লোকায়ত সাধনায় ও গুহ্য দেহতত্বের গান। স্ব সম্প্রদায়ের বাইরে এর বোদ্ধা বিশেষ নেই।

(৬) ভাওয়াইয়া -- উত্তরবঙ্গের উৎসব গীতি ।

(৭) ঝুমুর-- রাঢ়বঙ্গের সনৃত্য সংগীত ।

লোকসংগীত নিয়ে বিতর্ক - যাঁরা লোকসংগীতের চর্চা করে থাকেন তাদের মধ্যে দুটি দল আছে ।

একদল মনে করেন লোকসংগীতে পুরানো কথা সুর এবং যতদূর সম্ভব গায়ন ভঙ্গীকেও তাদের পুরানো অবিকৃত রূপে বাঁচিয়ে রাখা চাই আর এক দল মনে করেন যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখানেও কথায় ও সুরে যুগোচিত পরিবর্তন করলে দোষ নেই ।

লোকসংগীত একটিপ্রবহমান শিল্প। এর কোনও স্বরলিপি ছিল না, গুরুকুল ছিল না। লোকের মুখে এর সৃষ্টি হয়েছে এবং লোকের মুখেই তা বরাবর বেঁচে থেকেছে । তাই একথা সত্য যে এখানে অতীত কাল থেকে বহু পরিবর্তন সর্বদাই হয়েছে। কথা এবং সুর উভয়তঃ । কিন্তু মনে রাখতেহবে সে পরিবর্তন যারা এ গান গাইত তাদের গমীণ জীবনের পরিবর্তমান অভিজ্ঞতার বাইরে যায় নি। তাই এ গানের চরিত্র অক্ষুণ্ণ থেকেছে । কিন্তু বর্তমানে গ্রামীণ জীবনের পুরানো প্যাটার্ন যখন সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং গ্রামীণ শিল্পীদের ওপর শহরের মিডিয়াজাত চির আর্কষণ সর্বব্যাপী তখন এই গানগুলিকে যথাযথ রক্ষা করবার দায় সংগীতপ্রেমীদের থেকেই যায় । আজকের দিনে নিরক্ষর দরিদ্র অজ্ঞাত গ্রামীণ প্রকৃত লোক গায়ক যাঁরা আছেন তাঁরা তাঁদের বিশুদ্ধ লোকগীতি রক্ষা করার চেয়ে জীবন ও জীবিকার তাগিদে একালে চলতি গানই গাইতে চাইবেন। লোকসংগীত গাইবেন সচেতন শিক্ষিত লোকসংগীত অনুরাগী শিল্পী। শ্রোতামাত্রই অনুভব করেছেন লোকসংগীতের সুরে যে কোনও কথা বসালেই তা লোকগীতি হয় না যেমন রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি বা চল্লিশের দশকের গণসংগীত লোকগীতি নয় । তেমনি আজকাল উত্তরবঙ্গ বা ঝাড়খন্ডের উপভাষায় কবিতা আবৃত্তি যা কোনো কোনো মহলে চালু হয়েছে সেটাও লোকজীবনের মনের কথা বলে না, বলে আধুনিক মানুষের মনের কথাই । এইসব দেখে মনে হয় লোকগীতিও বেঁচেছিল শুধু ভাবে বা ভাষায় নয়, দুয়ের সংমিশ্রণে তার একটি নিজস্বচরিত্র নিয়ে। সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবার আগে তার স্বরূপটি সযত্নে রক্ষা করে রেখে দেওয়া দরকার। বাংলা গানের ভান্ডারে তা একটা স্থায়ী সম্পদ হয়ে থাকবে ।

উপসংহার –

বাংলা গানের ধারাবাহিক ইতিহাস অতিসংক্ষেপে আলোচনা করা হল। এর শতশাখায়িতবৈচিত্র্য সম্বন্ধেএকটা প্রাথমিক ধারণা দেওয়াই প্রাবন্ধিকের উদ্দেশ্য । অনেক উল্লেখযোগ্য বিষয় ও ব্যক্তি এখানে উল্লিখিত হননি সে ত্রুটি প্রথমেই স্বীকার করি । উপসংহারে তার সঙ্গে আরও দুএকটি কথা যোগ করতে চাই ঃ

(১) এই আলোচনা শুধুমাত্র বাংলা কাব্যগীতির আলোচনা । বাংলার সামগ্রিক সংগীত সাধনার আলোচনা নয়। এদেশে বিশুদ্ধ ক্লাসিকাল গানের চর্চা চিরকালই হয়ে এসেছে এবং সেখানকার কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে বহু শিল্পী ও সাধক এসেছেন। যেহেতু সে সংগীতধারা বিশেষভাবে বাংলার নিজস্ব সংগীত নয় সেইজন্য আলোচনা করা হয়নি ।

(২) প্রবন্ধমধ্যেপাগাধুনিক গানের কথার কিছু কিছু উদ্ধৃতি নমুনা স্বরূপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও তৎপরবর্ত্তী ধারাগুলির থেকে কোন উদাহরণ দেওয়া হয়নি । কারণ এই গানগুলি সর্বদা শুনতে পাওয়া যায়। এগুলি প্রচলিত রয়েছে তাই পাঠকগণ প্রবন্ধের বক্তব্য বুঝবেন ধরে নেওয়া গেল ।

(৩) গত শতাব্দীর গোড়ায় এসেছিল রেকর্ডেরগান। সত্তরের দশকে এল ফিতের গান এবং নববইয়ের দশকে এল কেব্‌ল্‌ বাহিত বিশ্বসংস্কৃতি। প্রথমটির বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা থাকলেও বাংলা গানের ওপর পরবর্ত্তী দুটির প্ভাব নিয়ে কিছু বলা হয় নি। ফিতের গান সম্বন্ধেএটুকু বলা যায় যে রেকর্ড দ্বারা যে প্রক্রিয়া সুরু হয়েছিল ফিতে সেটা আরও বহুগুণিত করে দিল । গান সংরক্ষণ শ্রবণ ও বিপণন সবই সহজ ও সুলভ হয়ে গেল অনেকখানি। তবে গ্রামোফোন রেকর্ডে গান মুদ্রণের পদ্ধতি ছিল জটিল এবং ব্যবসায়িক কোম্পানীগুলির সহায়তা ব্যতীত তা হত না। তার ফলে মুদ্রিত গান সম্বন্ধেএকটা নিম্নতম মান অবশ্যই বজায় থাকত কিন্তু এখন মুদ্রণ সহজ হয়ে যাওয়ায় বহু অযোগ্য গান ক্যাসেটে স্থান পেল এবং অচল টাকার উৎপাতে সচল টাকার যে বিপদ হয় ভালো গানের ক্ষেত্রেও সেইরকম বিপদ কিছু কিছু হয়েছে। তৃতীয়টিরসম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করার সময় এখনও আসেনি ।

(৪) শতাব্দী পূর্বে গান শোনা ছিল শ্রম, সময় এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যয়বহুল অভিজ্ঞতা । এখন কেউ যদি দুটো দিন কোনোরকম গান না শুনে কাটাবেন মনে করেন তবে তা কখনই সম্ভব হবে না । এখন শহর গ্রাম নির্বিশেষে ক্যাসেট বাহিত নানা প্রকার সংগীত আমাদের চেতনার ওপর সর্বদাই আছড়ে পড়ছে । এতে মানুষের সাংগীতিক চাহিদা ও অনুভবশক্তি যে কিছুটা ভোঁতা হয়ে গেছে তাতে সন্দেহ নেই , কিন্তু তবু মানবপ্রকৃতির আপনার নিয়মে এর মধ্যে একটা শ্রেণী বিভাগ হয়ে গেছে। যে গান আমরা অর্ধমনস্কভাবে শুনতে বাধ্য হই তা আমাদের চেতনার বাইরে থেকে যায়। যা পছন্দ করি তারজন্য আলাদা আয়োজন। গানের পিপাসা আমাদের কমে নি।

(৫) বাংলাগানের ভান্ডরটি এখন সুবিশাল। নানা চির মানুষের জন্য, বিভিন্ন অবস্থার জন্য, রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন গান। রবীন্দ্রনাথের নিভৃত ঘরের ধ্যান, অতুলপ্রসাদের সমাহিত বিষাদ, রজনীকান্তের ঈশ্বরে সর্বসমর্পণ, দ্বিজেন্দ্রলালের উদাত্ত উচচারণ আমাদের মনের যে অংশে প্রতিধবনি তোলে, নজরুলের জগৎ তার থেকে আলাদা । লঘু স্বপ্নমোহে সুরের ইন্দ্রজাল আমাদের আচছন্ন করে ফেলে । আধুনিক গানে সুর-বৈচিত্র্যের চমকে মুগ্ধ হই । কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে মানুষের গল ায় দু চারটি কলি গুন গুন করে ওঠে। তার হৃদয় ভার লঘু হয়ে যায়। সুর নিয়ে খেলা করার এই মজা আমাদের মনের অন্য একটা অংশ অধিকার করে নেয়। এমনকি জীবনমুখী গান বা বংলা ব্যান্ড্রে তিরস্কারেও আপত্তি হয়না কারণ তিরস্কার থেকে হুলটা বাদ দিয়ে আমরা বেছে নিই আমোদটুকু, ঠিকযেমনভাবে কবিগানের আসরে এক কালে শ্রোতারা গালিগালাজ উপভোগ করত । এ সব ছেড়ে আদিম সরলতার পিপাসায় কখনো বা লোকগীতির দরজাতেও কান পাতি। আর সর্বোপরি কণ্ঠ ও যন্ত্রে বিশুদ্ধ ক্লাসিকাল সঙ্গীত তো আছেই।

সবই আমাদের দরকার। সবই আত্মার পাথেয়। এই সব নিয়েই আমাদের গান।